ক্ষুদ্র স্বার্থ যেখানে বড়ো কথা,
সেখানে ফেডারেল ফ্রন্ট
হবে কেমন করে?
— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

মার্কসবাদ অথবা বুর্জোয়া
গবেষণাগারে বানানো
সর্বহারার টনিক
—পৃঃ ১৩

৭০ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা।। ৬ আগস্ট ২০১৮।। ২০ শ্রাবণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

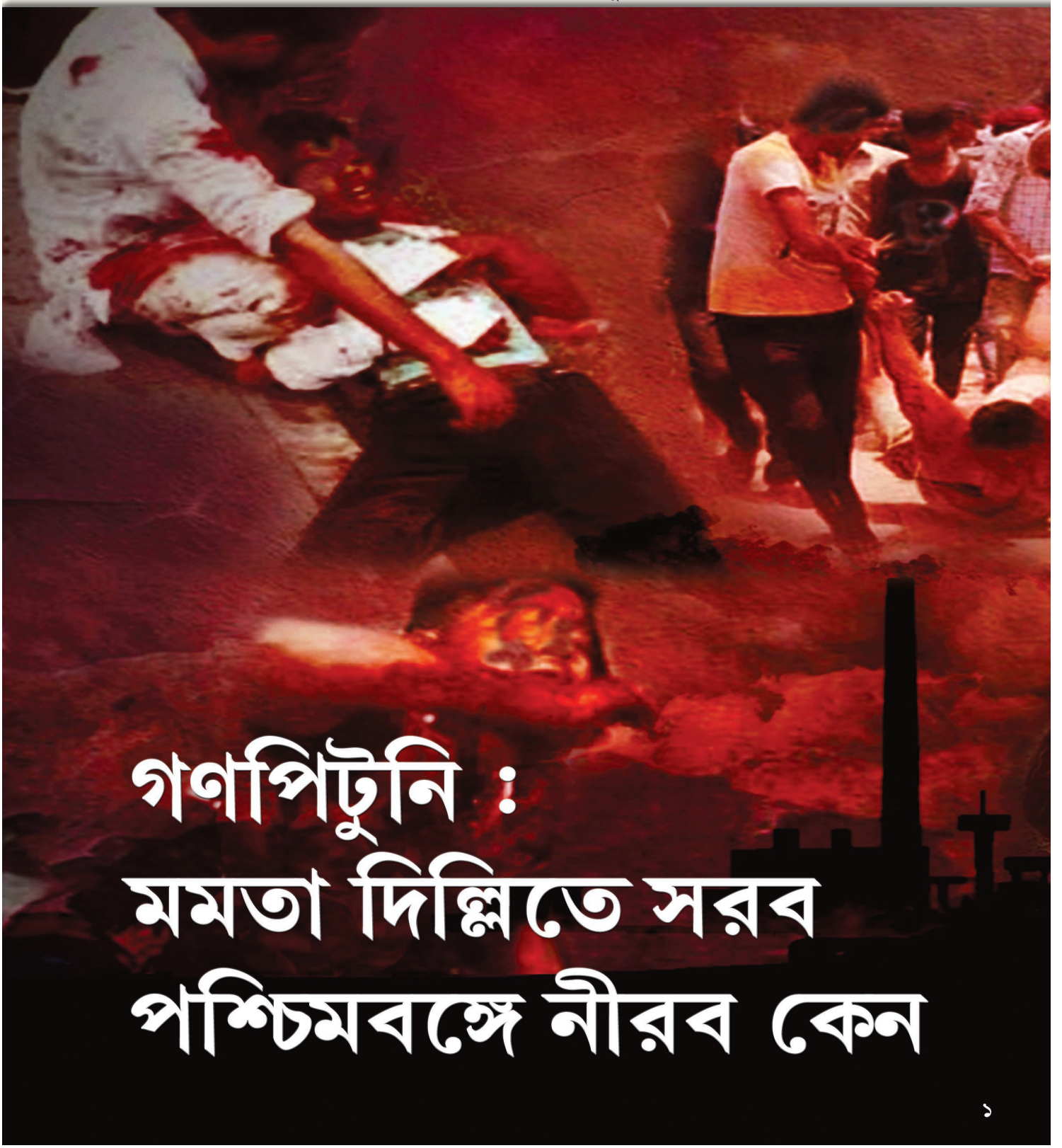

গণপিটুনি : মমতা দিল্লিতে সরব পশ্চিমবঙ্গে নীরব কেন

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৫০ সংখ্যা, ২০ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৬ আগস্ট - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ইমরানের সুসম্পর্ক পাকসেনার ফাঁদ ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

সাধু-সন্তরা আজ নীরব কেন? ▯ চন্দন রায় ▯ ৭

রাহুল গান্ধীর আলিঙ্গনের মধ্যে হৃদয়ের ছোঁয়া ছিল না ▯ সন্তোষ দেশাই ▯ ৮

ক্ষুদ্রস্বার্থ যেখানে বড়ো কথা, সেখানে ফেডারাল ফ্রন্ট হবে কেমন করে? ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

মার্কসবাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক ▯ দেবাশিস লাহা ▯ ১৩

লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনবে ▯ সৌমী দাঁ ▯ ১৫

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : রাহুল বলে বাহু তুলে নেচে নেচে আয় ▯ ১৭

বিপন্ন বিরোধীদের সম্বল এখন গুজবের রাজনীতি ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৩

গণপিটুনি : মমতা দিল্লিতে সরব, পশ্চিমবঙ্গে নীরব ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৬

গৌরীমা ও গোপালের মা অনন্ত শক্তির প্রতিভূ ▯ শ্রাবণী সিংহ ▯ ৩১

ইতিহাসের কথায় পুরীর জগন্নাথ মন্দির ▯ বিমলকৃষ্ণ দাস ▯ ৩২

গল্প : দু'হাজার উনিশ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ৩৫

স্মরণে : বেদনাহত ৬ আগস্ট▯ ড. তিলকরঞ্জন বেরা ▯ ৪১

'কংগ্রেস মুসলমানদের দল' বলে রাহুল কোনও অন্যায় করেননি▯ কমল মুখোপাধ্যায় ▯ ৪৩

শ্রাবণ মাসের কৃষিকাজ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০**▯ **শোকসংবাদ : ৪২** ▯ **রঙ্গম : ৪৯** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
১৩ আগস্ট, '১৮

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৩ আগস্ট, '১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দেশ ভাগ

স্বাধীনতা দিবস বলতে প্রথমেই মনে পড়ে দেশভাগের কথা। কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্ব এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের ফলে ওইদিন থেকেই ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল। যার বিষময় ফল আজও ভারতবর্ষ ভোগ করে চলেছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— দেশভাগ। লিখবেন নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, প্রণব দত্ত মজুমদার প্রমুখ।

দাম একই থাকছে।। দশ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

উন্নয়নে শিল্পপতিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য

শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠতা লইয়া প্রায়ই বিরোধীরা অভিযোগ তুলিয়া থাকেন। বিশেষত কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী প্রায় নিয়ম করিয়া প্রতিটি সভায় মোদী, শিল্পপতি, সঙ্ঘ লইয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করিবার সময় তিনি মোদীকে 'ভাগীদার' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। সাধারণ গরিব, কৃষকদের গুরুত্ব না দিয়া মোদী শিল্পপতিদের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। এমনকী সাম্প্রতিক রাফায়েল যুদ্ধবিমান কিনিবার চুক্তির ক্ষেত্রেও এনডিএ সরকার বিশেষ কোনও একজন শিল্পপতিকে বাড়তি সুবিধা দিয়াছেন বলিয়া রাহুল গান্ধী অভিযোগ তুলিয়াছেন। সেইসব অভিযোগের জবাবে উত্তরপ্রদেশের এক বিনিয়োগ সভায় উপস্থিত বহু বিশিষ্ট শিল্পপতির সামনেই প্রধানমন্ত্রী চাঁচাছোলা ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন—প্রকাশ্যে শিল্পপতিদের পাশে দাঁড়াইতে তিনি ভীত নন। বস্তুত তিনি এইদিন বুঝাইয়া দিয়াছেন যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা ঠিকই করিয়াছেন। শিল্পপতিদের লুটেরা বা চোর অপবাদ দিয়া অপমান করা ঠিক নহে। দেশের উন্নয়নে শিল্পপতিদেরও বড় ভূমিকা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নজির তুলিয়া ধরা হইয়াছে। গান্ধীজীও বিড়লাদের বাড়িতে থাকিতেন। তিনি কোনও দিন এইজন্য কুণ্ঠিত হন নাই। কেননা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ।

বস্তুত যে সকল কাজের জন্য বিরোধীরা মোদী সরকারের সমালোচনা করিয়া চলিয়াছেন, সেই কাজগুলি কিন্তু আগেকার। মোদী সরকারের চারবছরে এইসব কাজ হয় নাই। যে বিষয়টি বিশেষ বিসদৃশ, রাহুল গান্ধী কমিউনিস্টদের মতো একটি পরিবেশ তৈরি করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, শিল্পপতিরা গরিব বিরোধী হয় এবং তাহাদের উৎসাহ দেওয়া ঠিক নহে। আরও হতাশার বিষয়, বিদেশে পড়াশোনা করা সত্ত্বেও রাহুল গান্ধী নিজেকে গরিব দরদি প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন, দারিদ্র্যের মহিমাকীর্তন করিতেছেন। আজ এই দেশে যে রাস্তাঘাটের উন্নতি হইয়াছে, ইহা শুধু যাহাদের গাড়ি আছে তাহাদের কাজে লাগিবে—রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্য সেই মানসিকতারই প্রমাণ। রাহুল গান্ধী যখন এইসব কথাবার্তা বলিতেছেন তখন বোধ হয় তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কীভাবে গরিবি হটাও ধ্বনি দিয়াছিলেন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শিল্প বিকাশের জন্য বিশেষ বিল সংসদে পেশ করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে শিল্পের বিকাশ শুধু আবশ্যক নহে, অনিবার্যও বটে। ভারতের মতো গ্রামীণ জনসংখ্যা বহুল দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করিবার জন্য শিল্পের দ্রুত বিকাশ ব্যতীত উপায় নাই। বিড়ম্বনার বিষয় হইল শিল্পের দ্রুত বিকাশের প্রচেষ্টার প্রশংসা না করিয়া বিরোধীদের একাংশ শিল্পপতিদেরও বিরোধিতা করিতেছেন। এই ক্ষেত্রে আদানি-আম্বানি শিল্পগোষ্ঠীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছেন। রাফায়েল যুদ্ধবিমান কিনিবার ক্ষেত্রে অনিল- আম্বানি কোম্পানি ঠিকা কেন পাইয়াছেন বলিয়া প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইল, অনিল আম্বানি কোম্পানি ঠিকা পাইয়া থাকিলে তাহা কি কোনও অনুচিত কাজ হইয়াছে? নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিল্পপতিদের খলনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করিবার প্রয়াস অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই প্রয়াস শিল্প-ব্যবসা জগতের জন্য অকল্যাণকর শুধু নহে, যে সকল গরিব যুবক রোজগারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ লইয়াও তাহারা খেলা করিতেছেন।

সুভাষিতম্

কুস্ত্রী হন্তি কুটুম্বানি কুপুত্রো হন্তি বৈ কুলম্।
কুমন্ত্রী হন্তি রাজানং রাষ্ট্রং চৌরেণ হন্যতে।। (চাণক্য নীতি)

কুভার্যা কুটুম্ব নাশ করে। কুপুত্র বংশ নাশ করে। কুমন্ত্রী রাজাকে বিনাশ করে এবং চোর রাজ্য নষ্ট করে।

ইমরানের সুসম্পর্ক বার্তা পাকসেনার ফাঁদ

ইমরান খান ও তাঁর দল তেহরিক-ই-ইনসাফ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সর্বাধিক আসন জিতে জোট সরকার গড়ে ক্ষমতায় আসছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সরকারের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটা কেমন হবে? ইমরান বলেছেন, কাশ্মীর সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের মাধ্যমেই ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে পারে। এটা নতুন কথা নয়। অতীতে সব পাক প্রধানমন্ত্রী একই কথা বলেছেন। কাজ হয়নি। অটল বিহারী বাজপেয়ী পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সবরকম সাহায্য দিয়ে। বিনিময়ে পাকিস্তান ভারতকে কার্গিলের যুদ্ধ উপহার দিয়েছে। বিগত ৭১ বছর পাকিস্তানে গণতন্ত্র নেই। সেনাবাহিনীর নির্দেশে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা সবই চলে। পাক সেনা এবং গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই চাইলে নির্বাচনে জয় সম্ভব। পাক জাতীয় নির্বাচনে আজ পর্যন্ত নাগরিক মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। যেমন, ইমরান খান নির্বাচনে পাক সামরিক বাহিনীর পছন্দের প্রার্থী ছিলেন। তিনি সেনার নির্দেশমতোই চলবেন তাতে সন্দেহ নেই। অতীতে অনেক নির্বাচিত পাক প্রধানমন্ত্রীকে কুরশি ছাড়তে হয়েছে সেনার নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে। সুতরাং ইমরানের প্রধানমন্ত্রিত্বর স্থায়িত্ব কতদিনের তা বলা সম্ভব নয়। বিশেষত, যেখানে তাঁর দলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নেই। সহজ কথায়, সেখানে নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে। তাই ৩০ শতাংশ ব্যালট গণনার পরেই ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে ইমরান খান জিতে গেছেন। এরপরেও এই ভোটকে প্রহসন না বললে অসত্য বলা হবে।

ইমরান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন না তৃণমূল সাংসদ এবং হার্ভার্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক সুগত বসু। তাঁর কথায়, ''ইমরানকে পাক সেনা পুরোপুরি সমর্থন করেছে। সেনা যেভাবে চালাবে ইমরানকে সেভাবেই চলতে হবে। এই মুহূর্তে ভারত-পাক সম্পর্ক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে পাক সামরিক বাহিনীর কর্তারা যদি মনে করে সম্পর্ক কিছুটা সহজ হওয়ার দরকার তবেই হতে পারে। এটা ইমরানের হাতে নেই। পাকিস্তানে সেনা কর্তারা যা ঠিক করবে সেটাই হবে। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শুধুই সাক্ষীগোপাল। যদিও ইমরান সেনারই প্রার্থী। তবু প্রতি পদে তাঁকে সেনা কর্তাদের অনুমতি

গূঢ় পুরুষের কলম

নিতে হবে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানাচ্ছে যে, পাকিস্তানে ক্ষমতার তিনটি কেন্দ্র থাকে। সেনা, আই এস আই, প্রধানমন্ত্রী। এবারে যেহেতু ইমরান সেনার প্রতিনিধি ছিলেন তাই তৃতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রটি আর থাকছে না। সামনে অসামরিক সরকারকে রেখে পুরোটাই বকলমে নিয়ন্ত্রণ করবে সেনা। সেনা চাইবে না ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে। তাই ইমরান যতই বলুন, 'শান্তির পথে ভারত এক পা এগোলে পাকিস্তান দুই পা এগোবে', বাস্তবে তার কিছুই হবে না। কারণ, এই বিষয়টি ইমরানের হাতে নেই। ভারতের কাছে আশার আলো একটাই। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ মুম্বইতে পাকজঙ্গি হামলার প্রধানচক্রী হাফিজ সইদকে ভোট দেননি। তাঁরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত সব প্রার্থী ভোটে পরাজিত। হ্যাঁ, ভোটে ডাহা ফেল ভারত বিরোধী জঙ্গি প্রার্থীরা। এটাই ভারতের কাছে আশার আলো। দুই দেশেরই সাধারণ মানুষ জঙ্গিদের চায় না। পাক সেনার পূর্ণ মদতেও একজনও জঙ্গি প্রার্থী জেতেনি। কিন্তু জঙ্গি না হলেও কট্টর ইসলামি দল বা জোট মুত্তাহিদা মজলিস-এ- আমাল জিতেছে ১৩টি আসন। কিন্তু কট্টর সুন্নি মুসলমান দল তেহরিক-ই-লবাইক এবার একশোরও বেশি প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু একজন প্রার্থীও জেতেনি। জেতা দূরের কথা কেউ তৃতীয় স্থানে পৌঁছয়নি। পাক মিডিয়া বলছে, মৌলবাদী জঙ্গি এবং সাম্প্রদায়িক সুন্নি প্রার্থীদের হারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ।

ভারত বিরোধী জঙ্গিরা চিরকালই পাক সেনার মদতপুষ্ট। তবু শত চেষ্টাতেও তাদের ভোটযুদ্ধে সেনাকর্তরা এবার জেতাতে পারেনি। ইমরান খান ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। ভারতের প্রাক্তন এয়ার ভাইস মার্শাল কপিল কাক বলেছেন, 'নওয়াজ শরিফের দলকে কোণঠাসা করে পাক সেনা ও আই এস আই গোয়েন্দা সংস্থা ইমরান খানকে জিতিয়ে এনেছে। মনে হয় না সীমান্তে শান্তি ফিরবে। উল্টে পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর অবস্থান মজবুত হবে।' ব্যক্তিগতভাবে আমি ইমরানের সুসম্পর্কের বার্তায় বিশ্বাস করি না। সেনা নিয়ন্ত্রিত পাক রাজনীতির মূল কথাটি হচ্ছে ভারত বিরোধিতা। ভারতের জুজুর ভয় দেখিয়ে পাক সেনাকর্তারা এবং রাজনীতিকরা সেখানে অবাধে সরকারি তহবিল লুঠছে। সেনার রক্তচক্ষুর ভয়ে সাধারণ মানুষ চুপ। যেমন, কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় এলে পাকিস্তান কাশ্মীর সীমান্তে হামলা বাড়ায়। সম্প্রতি লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুভাষ ভামরে বলেছেন, চলতি বছরের প্রথম ছ'মাসেই শহিদ হয়েছেন ৫৫ জন ভারতীয় জওয়ান। জখম হয়েছেন ১৯৯ জন। পুঞ্চ, রাজৌরির মতো সীমান্ত এলাকায় গ্রাম ফাঁকা করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হয়েছে বাসিন্দাদের। জবাবে ভারতীয় সেনা আক্রমণ চালিয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি ভারতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। তা আড়াল করতেই ইমরানের সুসম্পর্কের বার্তা। এটা একটা ফাঁদ। এই ফাঁদে পা দেওয়াটা ভুল হবে। মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। ■

সাধু সন্ত আজ নীরব কেন!

চন্দন রায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুনকে একটা সময় বলেছিলেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

যখনই ভারত তথা পৃথিবীতে অসাধু অসৎ সমাজ ও দেশ বিরোধী অসুর শক্তির অত্যাচারে নিপীড়নে সাধারণ নিরীহ মানুষ সাধু সন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কষ্ট ও দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করে, তখন ভগবান স্বয়ং সপার্ষদ সাধু সন্ত মানব রূপে অবতীর্ণ হয়ে দুষ্টের দমন ও সৃষ্টির পালন করে থাকে এটাই বারবার ভারত ভূমিতে প্রমাণিত হয়েছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রসাতলে যাবে। সমাজ দেশ ও জাতি বিলীন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। যদি পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে দেখি অনেক দেশ, সভ্যতা ও বহু জাতি তার জগৎ সভা থেকে হারিয়ে গেছে।

আমাদের দেশভূমি ভারতবর্ষ এই অভিশাপ থেকে কখনই মুক্ত নয়। যুগে যুগে বার বার ভারতভূমিতে এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। বুদ্ধ যুগে বুদ্ধিস্ট রাজন্য বর্গের সক্রিয় সহযোগিতায় বুদ্ধ অনুসারীদের আসুরিক অত্যাচার নির্যাতন ও দেব মন্দির ধ্বংস প্রাচীন সনাতন সংস্কৃতির উপর চরমভাবে আঘাত করেছে, বলপূর্বক হিন্দুজাতির উপর বুদ্ধধর্ম বিশ্বাস ও মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। আবার মধ্যযুগে আরবীয় মুসলমান হানাদার বাহিনী ভারতভূমি দখল করে ভারতীয় সমাজের উপর দমন পীড়ন করেছে, লুণ্ঠন, হত্যা, নারী হরণ নির্যাতন অসুর শক্তির প্রধান ও পবিত্র কর্ম হিসাবে পরিগণিত ছিল। ছলে বলে কৌশলে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে মুসলমানে রূপান্তরিত করেছে। আবার ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় খ্রিস্টীয় ধর্ম যাজকরা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে দেবভূমিতে খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রসার এবং ছলনার আশ্রয়ে ও অন্যায় ধর্মান্তরকরণে মেতে উঠেছে। এই বিপর্যয় হতে মুক্ত হয়ে বার বার ভারতবাসী স্বমহিমায় স্বগরিমায় হৃতগৌরব উদ্ধার করেছে। এর প্রধান শক্তি ছিল প্রাচীন ঋষি সাধু সন্ত সন্ন্যাসী সমাজ ও শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সমাজ ও মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা! সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সৃজনশীল সৎ ও সাধু কার্যক্রমে সমাজ দেশ ও দশের কল্যাণে জাগ্রত সেনানী হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বর্বর অত্যাচারী বিধর্মী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সাধুসন্ত, সন্ন্যাসী ও পূজারিকুল ও ভক্তকুলদের নিয়ে কাঁসর ঘণ্টা ত্রিশূল হাতে অসম যুদ্ধে সমাজ দেশ ও দশের রক্ষায় নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি দেবালয় রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও আত্মবলিদান দিয়েছে। গুরুগোবিন্দ সিংহ, বান্দা বৈরাগী ও হাজার হাজার সাধুসন্তের নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আবার অনেক সাধুসন্ত সন্ন্যাসী দেশ ও সমাজ গঠনে সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগের ফল স্বরূপ রক্ষা পেয়েছে সনাতন ধর্ম সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা ও পরম্পরা।

আমরা ভারতপ্রেমী দেশভক্ত জনসাধারণ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, যখনই ভারতভূমি বিশ্ব দরবারে সঠিক ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছে তখনই ঘৃণ্য জাতীয়তা বিরোধী ভারত বিরোধী বহিঃ ও আন্তঃশক্তি ভারতের গৌরবের শিখর শিরচ্ছেদ করার জন্য স্বাধীন ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি কলুষিত ও দুর্বল করে তোলে এবং বলিষ্ঠ শক্তিশালী ভারত গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটাই ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ও অভিশাপ।

আজ ভারত বিভাজনের ৭০ বছর পর পুনরায় পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ক্ষমতা ভারতের সংকীর্ণ সনাতন সংস্কৃতি বিরোধী সেকু-মাকুরা সংকীর্ণ রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয় সহযোগিতায় ও মদতে ১৯৪৭ সালের মতো পাকপ্রেমী পাকিস্তানপন্থী ও সমর্থকদের দখলে। তাদের পাশবিক অত্যাচার অরাজকতা ও তাণ্ডবের হুংকারে বাংলার মাটি কম্পিত। এমতাবস্থায় শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নীরবতা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুনরায় করুণ পরিণতি ও দুর্দশার কথা ভেবে আমাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। সাধুসন্তরা সনাতন সমাজের অগ্রণী সেনানী। প্রাচীন ঋষি ও দেব-দেবীর মতো অসুর নিধনে সনাতন ধর্ম রক্ষায় তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে।

দেশ আছে তাই জাতি আছে, ভক্ত আছে। ভক্ত আছে বলে ভগবান আছে। ভগবান-শূন্য মন্দিরের ধ্বংস ও লুপ্ত অনিবার্য। তাই দেশ ও সমাজ, ভক্ত ও ভগবান, দেব মন্দির ও সনাতন ধর্ম এবং সংস্কৃতি রক্ষায় সাধুসন্তদের এগিয়ে এসে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ অজেয় শক্তি রূপে দাঁড় করাতে হবে।

রাহুল গান্ধীর আলিঙ্গনের মধ্যে হৃদয়ের ছোঁয়া ছিল না

অতিথি কলম

সন্তোষ দেশাই

সম্প্রতি সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব বিতর্কে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর ভাষণ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু লেখার সঙ্গে অনেক জলও ঘোলা হয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে আচম্বিত আলিঙ্গন নিয়ে আরও শোরগোল পড়েছে। এই ঘটনা আজকের ভারতের রাজনীতিকে কতটাই যে প্রকরণ ও ব্যক্তিনির্ভর হিসেবে দেখা হয় তারই জলজ্যান্ত নিদর্শন। অবশ্য সংসদে যে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য বিষয়টি তোলা হয়েছিল তার ভবিষ্যৎ ছিল সম্পূর্ণ পূর্বানুমিত। সেই অনাস্থা প্রস্তাব পরিণতিতে কিন্তু ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কিছু ইঙ্গিত রেখে গেল।

অবশ্যই এই সূত্রে রাহুল গান্ধী খানিকটা সুবিধে নিশ্চয় অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাঁর নিজের দলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। কংগ্রেসের বেশ বড় অংশের নেতারা তাঁর সংসদীয় যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ না করলেও যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। তাঁদের কাছে তিনি কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। বক্তৃতা চলাকালীন কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে সন্তুষ্টির হাততালি শোনা যাচ্ছিল তা যতটা না রাহুলের পিঠ চাপড়াতে তার চেয়ে ঢের বেশি নিজেদের হাঁফ ছেড়ে বাঁচার কারণে— যাক কমপক্ষে এতক্ষণে মুখ তো খুলেছে!

চমক দেবার জন্য হলেও তাঁর তোলা রেফ্যাল বিমান ক্রয় সংক্রান্ত হৈ-হট্টগোল নিয়ে কংগ্রেস ক্রমাগত বকবক করে যেতে পারবে। সরকারকে চাপে ফেলতে পারছে এমন একটা অনুভবও কাজ করবে। ভুঁইফোড় ইস্যু হলেও এটাকে নিয়ে মিডিয়ার নজর কিছুদিন ধরে রেখে প্রচার পাওয়ারও তো ব্যাপার আছে! সারবত্তার অভাবে তার অচিরে মিইয়ে যাবার আশঙ্কাই বেশি।

যাই হোক, তাঁর বক্তৃতা যতটা না সারবত্তার কারণে মানুষের হয়তো মনে থাকবে তার থেকে বেশি তাঁর আচরণের কারণে স্মরণীয় হবে। শাসকপক্ষকে তিনি কিছুটা অতর্কিত কাজকর্মের সম্মুখীন করেছেন। কংগ্রেস এমন একটি দল যারা বরাবর তাদের নামের মাহাত্ম্য নিয়ে চলতে ভালোবাসে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সময়োপযোগী হয়ে ওঠার কোনও লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। তাই হঠাৎ অন্তিম থেকে নতুন তাস বার করলে একটু অবাক হওয়ার অবকাশ থেকেই যায়। অতীতে যতবারই কংগ্রেস সভাপতি তাঁর বক্তব্য কিছুটা হালকা চালে পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছেন বা খুব উচ্চ কোনও নৈতিক অবস্থান নিয়েছেন তখনই তাঁকে খানিকটা ফাঁপা মনে হয়েছে। সেই হিসেবে এবারে তিনি নিজের কাছেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন, তা বক্তব্য যাই হোক না কেন।

হ্যাঁ, সকলেই যে বিষয়টা এইভাবে ভেবেছে তা নয়। সরকারি দলের সমর্থকরা নির্দ্বিধায় বলেছেন রাহুলের হম্বিতম্বি অপরিণত ও বালখিল্যসুলভ। গোটা পর্বটি মনোরঞ্জনকারী, অপেশাদার থিয়েটারের খণ্ডাংশ মনে হয়েছে যা জমেনি।

ভোটাভুটির শেষে দেখা গেল বিজেপি ৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে বিপুলভাবে জিতেছে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা তেলেঙ্গানার শাসকদল টি আর এস-এর অনুপস্থিত থাকা। গোটা নাটকের মধ্যে এই অংশটিই নির্বাচনী রাজনীতির নজরে দেখলে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এবারে আলিঙ্গন পর্বে আসা যাক। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে যদি এই উদাহরণকে একটা দিক পরিবর্তনের দিশারি আখ্যা দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে নিতান্তই যা যার পাওনা নয় অযাচিত ভাবে তাকে তা পাইয়ে দেওয়া। নিঃসন্দেহে এটি ছিল নিছক রাজনৈতিক চাল।

> রাহুল গান্ধী আদৌ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নন, কেননা তিনি যে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সে দল কখনই নিজের ক্ষমতায় বিজেপির কাছে দাঁড়াতে পারবে না। তাই আজকের বাস্তবতায় লড়াইটাকে রাহুল বনাম মোদীতে আবদ্ধ করে রাখতে পারলে তা নিশ্চিতভাবেই বিজেপি'র সুবিধে করে দেবে।

অবশ্যই চালাকিতে ভরা, কিন্তু তাৎক্ষণিক চমকটা অবাক করার মতোই। আর এটা যে সত্যি তা পরমুহূর্তেই প্রকাশ্য হয়ে যায় রাহুল গান্ধীর পরিকল্পিত চোখ টেপার মাধ্যমে। তাই রাহুল গান্ধী বিরোধী পক্ষের ওপর কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ না করার নিদর্শন হিসেবে যে আলিঙ্গনের রাজনীতি করলেন তা শুধুই প্রতীকী রয়ে গেল, তার মধ্যে হৃদয়ের ছোঁয়া আদৌ ছিল না।

বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে কংগ্রেস নিজেকে বারবার এমন একটা দল হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে যার বিরোধীদের ওপর ঘৃণার লেশমাত্র নেই। তাই অনাস্থা প্রস্তাব পর্ব শেষ হওয়ার পরও রাহুল গান্ধী টুইট করে জানাচ্ছেন— ''কংগ্রেস এটা প্রমাণ করে ছাড়বে যে জনগণের হৃদয়ে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা তৈরির মাধ্যমেই কেবল জাতি গঠন করা সম্ভব। এটিই একমাত্র পথ।'' নিশ্চয়, আজকের বিক্ষুব্ধ বাতাবরণে অনেকের মধ্যেই অসন্তোষ, ক্রোধ প্রদর্শিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে রুখে দাঁড়াতে, নিজেকে সফলভাবে তুলে ধরতে কংগ্রেস কি শুধু এই অস্ত্র নিয়েই লড়বে?

জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি স্বাভাবিকভাবে হিন্দুদের পক্ষে দাঁড়ানোর সংকল্পের বিরুদ্ধে এটিই কি হবে কংগ্রেসের হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা! সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষে হিন্দু বিরোধী দলের তকমাধারী হিসেবে ভোটে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার প্রেক্ষিতে এইরকম একটা ভাসা ভাসা, কিছুটা বিমূর্ত প্রেম-ভালোবাসার কথা বলে লোককে ধন্দে ফেলে দেওয়া সহজ হতে পারে। কেননা হিন্দু বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টা কংগ্রেসকে গত নির্বাচন থেকেই চিন্তায় রেখেছে। তবুও এই ভালোবাসার সংকেত যতক্ষণ না পর্যন্ত সরাসরি নজরে পড়ার মতো নীতিগত প্রয়োগে রূপান্তরিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটি নিছকই রাজনৈতিক দেখনদারি হিসেবেই থেকে যাবে। আর এই ধরনের চমক নির্দিষ্ট কিছু মানুষেরই মন-পসন্দ হবে।

দলের সামগ্রিক কৌশলের অঙ্গ হিসেবে এই ধরনের বিষয় থাকতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র কতকগুলি এই ঘরানার চটজলদি আচরণ যা অতি সহজসাধ্য তা করলেই বিপক্ষের সঙ্গে মৌলিক তফাত সৃষ্টি হবে সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই সব প্রতীকী কার্যকলাপ কখনই কংগ্রেস দলের তরফে কোনো বিকল্প শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর চেহারা তৈরি করতে পারবে না।

এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এগোনোর প্রধান বিপদ হচ্ছে এটা এক ধরনের মিথ্যে স্বাচ্ছন্দের অনুভূতি এনে দেয়। অবশ্যই এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের কাছে এই সব দৈহিক কার্যকলাপের বাড়তি আবেদন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর সুবুদ্ধিসম্পন্ন নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে এগুলি তেমন সাড়া জাগাবে না।

গরিষ্ঠাংশ মানুষজনের চিন্তাভাবনা অনেকটাই তৃণমূল স্তরে প্রথিত। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনেক গভীর সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। জীবন তাদের কাছে নিত্যদিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। একটি দল কায়দা-কানুন মেনে সুরুচিসম্পন্নভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারলেই মানুষ তাকে ভোট দেবে এটা কোনও যুক্তিই হতে পারে না।

আরও একটা জিনিস এক্ষেত্রে মাথায় রাখা দরকার। রাহুল গান্ধী তাঁর সাফল্যের মানদণ্ডটিকে এতই সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে বেঁধে রেখেছেন যে সেটিকে পার করতে পারলেই সবাই তারস্বরে বলতে থাকবে এই এসে গেল 'সাচ্চা নেতা'। মানদণ্ড বলতে উদাহরণ দিলে সহজ হবে। ধরুন কোনও পরীক্ষায় কেউ ২০ নম্বর পেরোলেই বলা হবে খুব ভালো করেছে, অথচ অন্যসব জায়গায় কম করে ৬০ না পেলে কেউ গ্রাহ্যও করবে না। রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক পারফরম্যান্স ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়ার একটা প্রবণতা কেবলমাত্র তাঁর কংগ্রেস দলের অভ্যন্তর থেকেই যে দেখা যাচ্ছে তা নয়। এমন অনেক পক্ষ থেকেই তাঁকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে যাঁরা ২০১৯ সালে যেনতেনপ্রকারেণ মোদী তথা বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উদগ্রীব।

এরপরও বলতেই হবে যে নির্মম সত্যটা হলো, রাহুল গান্ধী আদৌ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নন, কেননা তিনি যে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সে দল কখনই নিজের ক্ষমতায় বিজেপির কাছে দাঁড়াতে পারবে না। তাই আজকের বাস্তবতায় লড়াইটাকে রাহুল বনাম মোদীতে আবদ্ধ করে রাখতে পারলে তা নিশ্চিতভাবেই বিজেপি'র সুবিধে করে দেবে। তাই, কংগ্রেস দলের কাছে রাহুলের একজন বিশ্বাসযোগ্য নেতা হয়ে ওঠা শুভ হলেও তা সত্যে পরিণত হওয়ার পথে দলকে আরও অনেক কৌশলগত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তবেই ২০১৯-এর নির্বাচনের মোকাবিলা সম্ভব। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার আট পাতা বৃদ্ধি এবং আংশিক রঙিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিনি, পুরানো দামেই (১০ টাকা) এতদিন আমরা পরিবেশন করে এসেছি। কিন্তু ক্রমাগত ছাপার কাগজ ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮, শুভ জন্মাষ্টমী থেকে 'স্বস্তিকা'র প্রতি কপির দাম ১২ টাকা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

আশা করি, আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

রম্যরচনা

স্কুল পরিদর্শক এসেছেন স্কুলে। স্কুলে ঢুকেই নোটিশ বোর্ডে তার চোখ আটকে গেল। লেখা রয়েছে— 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আজ স্কুল পরিদর্শকের আগমন ঘটবে।' একপলক নোটিশটি দেখেই পরিদর্শক গটগট করে ঢুকলেন হেডমাস্টারের ঘরে।

বললেন— ছাত্ররা ক্লাসে সব এসেছে তো?

হেডমাস্টার— আজ্ঞে হ্যাঁ। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়...

এরপর ক্লাসে ঢুকে পরিদর্শক একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— আচ্ছা, বল তো প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল?

ছাত্র—আমাদের বাড়ির কলতলায় স্যার।

পরিদর্শক হতভম্ব। এরপর দ্বিতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— আচ্ছা বল তো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার কে লুট করেছিল?

দ্বিতীয় ছাত্র— আমি না স্যার। অসীম হতে পারে।

পরিদর্শকের রাগের মাত্রা চড়ছে। এবার তৃতীয় ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন— সিধু-কানহুর বিষয়ে কিছু বলতে পারবে?

তৃতীয় ছাত্র— না স্যার। ওদের ভাই ডহর জানে।

পরিদর্শক রেগে কাঁই। ছুটতে ছুটতে হেডমাস্টারের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন— এসব কে শিখিয়েছে ওদের?

হেডমাস্টার স্মিত হেসে বললেন— আজ্ঞে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়...

উবাচ

"অসমে নাগরিকপঞ্জী নবায়ন নিয়ে আমি বিপক্ষের কাছে জানতে চাই এতে কেন্দ্রের কী ভূমিকা রয়েছে? সবকিছু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হচ্ছে। এই ধরনের সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।"

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অসমে নাগরিকপঞ্জী নিয়ে সংসদে বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে

"ক্ষমতায় এলে আমরাও এ রাজ্যে নাগরিক নবীকরণ চালু করে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের গলাধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠাব।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্যসভাপতি

এন আর সি নিয়ে বিরোধীদের অপপ্রচার প্রসঙ্গে

"ইমরান আসলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতের যোগ্য পুতুল। সেনাবাহিনী তাদের জুতো পালিশের জন্য একজন যোগ্য লোককে খুঁজছিল।"

রেহাম খান
পাকিস্তানের সদ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দ্বিতীয়া স্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীপদে ইমরানের শপথ নেওয়া প্রসঙ্গে

"গণপ্রহার বর্বরোচিত অপরাধগুলির মধ্যে অন্যতম। কোনও সভ্যসমাজ একে সমর্থন করে না। গণপ্রহার বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই সংসদে বিল আনবে।"

হংসরাজ আহির
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী

দেশে ক্রমবর্ধমান গণপ্রহারের ঘটনা প্রসঙ্গে

ক্ষুদ্র স্বার্থ যেখানে বড়ো কথা, সেখানে ফেডারাল ফ্রন্ট হবে কেমন করে?

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

বিজেপি-কে হঠানোর জন্য সম্প্রতি বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁরা সামনের লোকসভা নির্বাচনে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে একটা 'ফেডারাল ফ্রন্টও খোলার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু ফেডারাল ফ্রন্টের কিছু সমস্যাও রয়েছে— সেগুলো নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

প্রথমত, এখন দুটো ফ্রন্ট রয়েছে— বিজেপি প্রভাবিত এনডিএ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ। বিজেপি বিরোধী 'ফেডারাল ফ্রন্ট' হলে ইউপিএ-র কী হবে? কংগ্রেস-সহ অন্যান্য শরিকরাও কি সেটা ভেঙে যোগ দেবে নতুন ফ্রন্টে?

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি জানিয়েছে যে, বর্তমানে ২০০৪টা রাজনৈতিক দল তার নথিভুক্ত হয়ে আছে— তাদের মধ্যে ১৫০০টা দল বেশ সক্রিয়। এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার। পৃথিবীর কোনও দেশেই এমন বহুদলীয় ব্যবস্থা নেই। বলা বাহুল্য, দু' চারটে ছাড়া এদের কোনও রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব বা মতাদর্শ নেই। জাতপাত, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিক স্বার্থ, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও লোভ, প্রতিশোধ-স্পৃহা, সরকারের অংশীদারিত্ব ইত্যাদি নিয়েই প্রায় ১৪০০ দল গড়ে উঠেছে। আর যাদের কিছু ঘোষিত মতাদর্শ আছে, তাদেরও লক্ষ্য হলো ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা। ড. এস. এল. সিক্রির ভাষায়— 'And, for that, they have been too willing to sacrifice an ideology'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১২২)। তার জন্য তারা সুবিধেমতো জোট তৈরি করে আবার প্রয়োজনমতো সেটা ভেঙেও দেয়।

এদের মধ্য থেকে কাকে বা কাদের নিয়ে 'ফেডারাল ফ্রন্ট' হবে, জানি না। বিজেপি-বিরোধী সব দলকেই ডাকা হবে? সবাই একসঙ্গে একটা কোয়ালিশন করবে? তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করা একটা দুরূহ কাজ। ক্ষুদ্র স্বার্থই সেক্ষেত্রে বড় কথা, সেখানে প্রস্তাবিত ফেডারাল ফ্রন্ট হবে কেমন করে? বিজেপিকে হঠানোর পর তারা একসঙ্গে কতদিনই বা থাকবে?

আসল কথা হলো--- রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত মৌলিক বিষয়ে সমঝোতা করা--- ড. বি.সি. রাউতের ভাষায়--- 'Political parties of India should agree on the fundamental principles'--- (ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২০৫)। অন্তত জোট গঠন করার ব্যাপারে কিছু তত্ত্ব বা আদর্শগত ঐক্যের দরকার। তা না হলে সেই সুবিধেবাদী ঐক্য অচিরেই অনৈক্যে পরিণত হয়। এই ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জি উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে টি ডি পি, টি আর এস, শিবসেনা, আর জে ডি, বি জে ডি ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা প্রভৃতি অনেক দল আছে। কিন্তু তাদের সম্মিলিত শক্তি কি এক্ষেত্রে যথেষ্ট? তাদের মধ্যে কি প্রয়োজনীয় ঐক্য আছে? আরও যারা যোগ দেবে, তাদের আসল লক্ষ্য কী হবে, মিলের ভিত তৈরি হবে কী দিয়ে? নেতৃত্ব দেবেন কে?

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুবিধাবাদটা প্রবল। তাই কোনও কোনও সময় ছোট দল বৃহত্তম দলের মদতে সরকার গঠন করেও সেটা টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

তৃতীয়ত, মনে পড়ছে— ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের আগে জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে সংগঠন-কংগ্রেস, ভারতীয় লোকদল,জনসঙ্ঘ, সমাজবাদী দল একত্রিত হয়ে 'জনতা দল' তৈরি করেছিল, তাতে যোগ দিয়েছিল জগজীবন রামের সি এফ ডি। তার ফলে ওই নির্বাচনে তার অভাবিত সাফল্য ঘটে, সরে যেতে হয় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসকে। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণও সেই ঐক্য ধরে রাখতে পারেননি। ২৮ মাসের মধ্যেই সরকারের পতন ঘটেছিল।

মমতা ব্যানার্জি কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতা নন। সুতরাং বিজেপি-কে সরানো গেলেও একটা স্থায়ী সরকার গঠন করা কঠিন কাজ। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুবিধাবাদটা প্রবল। তাই কোনও কোনও সময় ছোট দল বৃহত্তম দলের মদতে সরকার গঠন করেও সেটা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। চরণ সিংহ, চন্দ্রশেখর প্রমুখ প্রধানমন্ত্রীকে সরে যেতে হয়েছে কংগ্রেসের চাপ সৃষ্টির ফলে।

চতুর্থত, নতুন ফ্রন্টের অনেক নেতা-নেত্রী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে এই ব্যাপারে একত্রিত করার কথা বলেছেন। কোনও কোনও 'বুদ্ধিজীবী'ও মহা উৎসাহে এই কথা লিখেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো— কোন দল ধর্মকে

রাজনীতিতে টানেনি? কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই সুবিধাবাদ গ্রহণ করেছে। 'তাই হিন্দু কোড্ বিল', 'পার্সি ম্যারেজ অ্যাক্ট,' 'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট' ইত্যাদি প্রণীত হলেও, ৪৪নং অনুচ্ছেদের নির্দেশমূলক নীতির অভিন্ন দেওয়ানি আইন রচিত হয়নি শরিয়তের কথা ভেবে। সরলা মুদ্গালের মামলায় বিচারপতি কুলদীপ সিংহ বলেছিলেন—'no community can oppose the introduction of uniform civil code Bill।' কিন্তু একটা সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য আজও কেউ এই উদ্যোগ নেয়নি। বরং শাহবানো মামলার রায় অকেজো করার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৪ সালে 'মুসলিম উওমেন অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেছেন। মনমোহন সিংহ বলে ফেলেছিলেন— এই দেশের সব সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার মুসলমানদের। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধী মন্দিরে মন্দিরে ঘুরেছেন— তিনি নাকি ব্রাহ্মণ-শিবভক্ত।

সি পি আই (এম) একবার কেরলে 'প্রোগ্রেসিভ' মুসলিম লিগের সঙ্গে আঁতাত করেছিল। মাদ্রাসা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার পর চাপে পড়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন— দেশের মধ্যে তাঁর সরকারই মাদ্রাসার জন্য বেশি ব্যয় করে। লালুপ্রসাদ

শাহবানো মামলার রায় অকেজো করার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৪ সালে 'মুসলিম উওমেন অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেছেন। মনমোহন সিংহ বলে ফেলেছিলেন— এই দেশের সব সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার মুসলমানদের। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধী মন্দিরে মন্দিরে ঘুরেছেন— তিনি নাকি ব্রাহ্মণ-শিবভক্ত।

রেলমন্ত্রী থাকার সময় একটা কমিশন বসিয়েছিলেন এটা দেখানোর জন্য যে, ৫৯ জন করসেবক স্টোভ জ্বালানোয় রেলের কামরায় পুড়ে মরেছিলেন, অথচ কেন্দ্রীয় সরকার আগেই এই ব্যাপারে কমিশন বসিয়েছেন। তার রিপোর্টে— এটা ছিল জীবন্ত দগ্ধের ব্যাপার। মন্ত্রীকে শপথ নিতে হয়—"in the name of God।" কেউ কেউ কিন্তু শপথ নিয়েছেন 'ঈশ্বর' ও 'আল্লা' দুটি নামেই। সচদেব গুপ্ত তাই লিখেছেন, 'No party misses the chance of exploiting the religious sentiment'---(ইন্ডিয়ান কন্স্টিটিউশন, পৃ. ২২২)।

সব শেষে বলি— কেউ কেউ কমিউনিস্ট দলকেও এই ফ্রন্টে চেয়েছেন— এতে নাকি 'প্রকৃত' বিরোধী-জোটে হবে। কিন্তু এরা তো গণতান্ত্রিক দলই নয়— তারা যে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের কথা বলে, সেটা আসলে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-জে-দঙ্ ইত্যাদির স্বৈরী শাসন— (সি. ডি. এম. কেটেলবি— এ হিস্ট্রি অব মডার্ন টাইমস্)। এই ধরনের একটা দল সরকারে থাকলে শরিকদের কী অবস্থা হয়। সেটা ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভালো বুঝেছেন। তাঁদের অনেকেই স্বজন হারানোর বেদনা ভুলে কি এই জোটকে ভোট দেবেন? ■

জাতীয়তাবাদী
বাংলা সংবাদ
সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি কপি ১০.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund | HDFC MUTUAL FUND | SBI MUTUAL FUND A partner for life

মার্কস্‌বাদ অথবা বুর্জোয়া গবেষণাগারে বানানো সর্বহারার টনিক

দেবাশিস লাহা

গত ৫ মে, ২০১৮! সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেন সুনামি আছড়ে পড়ল। পড়ারই কথা। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ দুশ বছর আগে এই মহাবিশ্বে এক অবিসংবাদিত ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলে না। আহাম্মক, অজ্ঞ আর নিকৃষ্ট মানুষের পৃথিবীতে এঁর সমগোত্রীয় ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন— তিনি মহান নবি হজরত মহম্মদ। হ্যাঁ এঁকে নিয়েও কোনো প্রশ্ন চলে না। কারণ দুজনেই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে; নিখুঁত, নির্ভুল দুটি দর্শন তথা মতবাদের জন্মদাতা। একজন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। অপরজন এমন একটি ধর্মের প্রবক্তা যার মধ্যে মহাবিশ্বের সমস্ত জ্ঞানই নিহিত। হ্যাঁ, বিশ্বের মহানতম ধর্ম ইসলামের কথাই বলছি। এর আকর গ্রন্থটি হলো কোরান। কোরানে নেই এমন কোনো তথ্য অথবা জ্ঞান এই মহাবিশ্বেই নেই। তাই আলেকজান্দ্রিয়া থেকে নালন্দা— একের পর এক গ্রন্থাগার তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের বই নির্দ্বিধায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কারা পুড়িয়েছে সে নাই বা বললাম। কিন্তু পুড়িয়ে আলবাত ঠিক করেছে। কারণ কোরানই যখন আছে, তখন অন্য বইয়ের কী দরকার? সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান তো তার মধ্যেই। এই সর্বোচ্চ গ্রেডযুক্ত ভগবানদের জন্মদিন মানে তো বাঁধভাঙা জলোচ্ছ্বাস। হৃদয়ে হৃদয়ে সুনামির নৃত্য। আহা, বুক ভরে যায়। উথলে ওঠা পরান পাখিটিও সর্বহারা মুক্তির নীল আকাশে ডানা মেলতে চায়।!

তা কী ঘটল ওদিন? মানে? কী ঘটেনি জিজ্ঞাসা করুন! বিশ্বের বিশেষ করে জার্মানির সমস্ত প্রথম সারির খবরের কাগজে মহান দার্শনিক তথা ঈশ্বর কার্লমার্কসের ছবি— একেবারে ফ্রন্ট পেইজ জুড়ে! দিকে দিকে মিছিল! লাল পতাকার সঙ্গে মহান ভগবানের

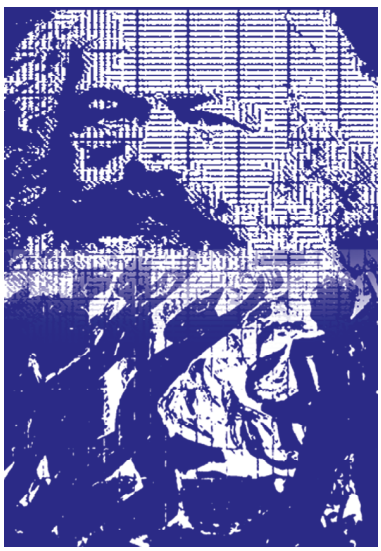

দৃপ্ত মুখচ্ছবি— কোথাও We shall overcome, কোথাও আমরা করব জয়, কোথাও ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না, পল রবসন! দু' একজন অশিক্ষিত লোকজন অবশ্য মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল— সেকি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিভূ বুর্জোয়া সংবাদপত্রে আপনাদের ঈশ্বরের ছবি ছাপানো হচ্ছে, জয়গান গাওয়া হচ্ছে— সেটা আবার বুক ফুলিয়ে বলছেন! একটু ভাবলে হয় না? যাদের উৎখাত করার জন্য এত আয়োজন, এত বইপত্র, এত লড়াই, তাঁরাই আপনাদের ভগবানটিকে লক্ষ লক্ষ স্কোয়ার মিটারের ফুটেজ দিচ্ছে! একটু ভাববেন না?

ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই হেসে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। মগজ যখন আছে, তখন চিন্তা করতে বাধা কোথায়! ব্যাপারটা কিন্তু রীতিমতো সন্দেহজনক। কার্লমার্কস নামক দার্শনিকটিকে মানুষ প্রথম কীভাবে চিনেছিল বলুন তো? অনেকেই জানেন। বন্ধু এঙ্গেলস-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখা The Communist Manifesto নামক মহাগ্রন্থটিই তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসে। জ্ঞাতার্থে বলি ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত এই বইটিই এখন বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত দ্বিতীয় বই। বাইবেলের পরেই। কি, বিস্মিত হচ্ছেন না? না হলে একটু একটু হতে শিখুন। ধনতান্ত্রিক তথা বুর্জোয়া আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সমাজব্যবস্থা (সর্বহারার একনায়কতন্ত্র, Dictatorship of the proletariet) গড়ে তোলার ডাক দেওয়া একটি মতাদর্শের বই এই বুর্জোয়া ব্যবস্থাতেই এত প্রচার পেল কীভাবে? এত বিক্রিই বা হলো কেন? রক্তচোষা বুর্জোয়া শিল্পপতিরা, তাঁদের তাঁবেদাররা এই সর্বনাশা মতবাদটিকে বাঁচিয়ে রাখল কেন? এ যুগেও অনেক চলচ্চিত্র, বই, মতাদর্শ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এবং শাসক শ্রেণীই সেটি করে থাকে। কিছুদিন আগেই এ রাজ্যে কলকাতা কিলিং-এর উপর একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করা হয়েছে। অথচ class struggle অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে "forcible overthrow of all existing social conditions' (বলপ্রয়োগ তথা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা) এমন একটি বিপদজনক মতাদর্শকে কেন সমূলে উপড়ে ফেলা হলো না? মার্কসবাদী, মাওবাদী, লেনিনবাদী সন্দেহে হাজার হাজার 'বিপ্লবী' মেরে ফেলা হয়— হ্যাঁ রাষ্ট্রই হত্যা করে। অথচ এই হিংসা, রক্তপাত, লড়াইয়ের প্রেরণাদাত্রী বইটির লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়ে চলেছে, দেদার বিকোচ্ছে, ধনতন্ত্রের প্রতিভূ সব সংবাদপত্র, ওয়েব সাইট, ই-কমার্স সাইট (ফ্লিপ কাট থেকে আমাজন) সবাই হুড়মুড়িয়ে বিক্রি করে চলেছে! প্রিয় বন্ধু, এই বুর্জোয়ারা কি কালিদাস? যে ডালে বসে আছে, সেই ডালটিই কেটে ফেলার এত উন্মাদনা! কি, এবার একটু ভাবনা পাচ্ছে তো? ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন!

বাহ্, এই তো! আপনারা ভাবতে থাকুন। আমি এই সুযোগে The Communist Manifesto নামক ঐশ্বরিক মহাগ্রন্থটির প্রকাশ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সেরে নিই। কী বললেন? প্রকাশ নিয়ে আলোচনার

দরকার নেই? আলবত আছে। ২০১৩ সালে যে বইটি! UNESCO's Memory of the World Programme-এর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ তালিকায় স্থান পায়, Das Capital-এর প্রথম খণ্ডের (এটিও মহান মার্কসের রচিত মহা গ্রন্থ) সঙ্গে, তার প্রকাশ নিয়ে ভাবতে হবে বইকি। কারণ UNO-ই বলুন আর UNESCO-ই বলুন সবই তো ধনতান্ত্রিক দেশের কব্জায়। সমগ্র বিশ্ব তো ওরাই নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশ তো প্রায় নেই বললেই চলে। চীনকে এখন কমিউনিস্টরাই সমাজতান্ত্রিক বলতে গররাজি। কবেই নাকি সংশোধনবাদী হয়ে গেছে। রইল হাতে এক কিউবা। কি বললেন উত্তর কোরিয়া? সে আবার ইউ এন এ-তে কবে ঢুকল। তবে পৃথিবীর সব বুর্জোয়ারা তাঁদের মৃত্যুবাণটিকেই এত বড় সম্মান দিয়ে বসল? এই রক্তচোষার জাত কি এতই মহান? কি গোলমেলে লাগছে তো? বইটির প্রথম প্রকাশ কিন্তু জার্মানিতে (মার্কস সাহেবের জন্মভূমি) ঘটেনি, হয়েছে লন্ডনে। ১৮৪৮ সালে ব্রিটেনই সমগ্র বিশ্বের বুর্জোয়াদের দাদা। আমাদের দেশেও তাঁদের দাপট চলছে। এক নম্বর, অপরাজেয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ। ধারে কাছে কেউ নেই। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন তখন পিকচারেই নেই। ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার মতাদর্শটি এমন একটি দেশেই প্রথম প্রকাশ পায়। তারপর কী হলো? সংক্ষেপেই বলি। তিনটি পুনর্মুদ্রণ হলো। কিন্তু সবই লন্ডনে। জন্মভূমি জার্মানিতে নয়। মার্কস তখন বেলজিয়ামে। বেলজিয়াম পুলিশ তাঁকে বহিষ্কার করে। ওই বছরই প্যারিসে তৎকালীন রাজা লুই ফিলিপ্পির বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ হয়। যদিও এর পেছনে The Communist Manifesto নামক বইটির কোনো ভূমিকাই ছিল না। তবু জার্মানি থেকেও মার্কস সাহেবকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপরই তিনি ব্রিটেনে আজীবন আশ্রয়ের প্রার্থনা করেন। অবাক কাণ্ড। চরম সাম্রাজ্যবাদী, রক্তলোলুপ ধনতন্ত্রের প্রতিভূ দেশটি চরম শত্রুটির প্রার্থনা মঞ্জুর করে। তারপরের ঘটনা সবাই কম বেশি জানেন। রক্তচোষা বুর্জোয়াদের দেশ ব্রিটেনে বসেই তিনি একের পর এক বই লিখে ধনতন্ত্রের মুণ্ডপাত করতে থাকেন। এবং অকাতরে, হাজারে হাজারে, হরির লুটের মতো সে সব বই ব্রিটেনের ছাপাখানায় ছাপা হতে থাকে। বুর্জোয়া শিরোমণি ব্রিটেনের রানি তাঁর মুক্তোদন্ত বিকশিত করে সেই অনাবিল দৃশ্য উপভোগ করতে থাকেন। বুর্জোয়া দেশে, বুর্জোয়া মিডিয়ার কল্যাণে মার্কস্ সাহেবের নাম ডাক সমগ্র বিশ্বে ছড়াতে থাকে! আহা! ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বীরোচিত লড়াই। সাপের ডেরায় বসে ব্যাঙ সাহেব সর্পবধ কাব্য লিখছেন আর সর্পসম্রাজ্ঞী শঙ্খচূড়িনী তাকে ছোবলের পরিবর্তে চুমুর পর চুমু খেয়ে যাচ্ছে! কী অনুপম দৃশ্য! মার্কস সাহেবের জন্মভূমিতে এই বইটি কবে প্রকাশ পেল জানেন? ১৮৬৬ সালে! বার্লিনে! ততদিনে কোটি কপি বিক্রি হয়ে গেছে। সমগ্র বুর্জোয়া বিশ্ব জেনে গেছে এ তো বেশ মাদারির খেলা! গরিব গুবরো পাবলিক যত খেলবে ততই আমাদের লাভ! এর পর দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল। নতুন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল আমেরিকা, রাশিয়া। শুরু হয়ে গেল ঠাণ্ডা লড়াই। আর সেই সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসার রমরমা। নেটো গোষ্ঠী বনাম ওয়ারশ গোষ্ঠী। কে কত অস্ত্র মজুত করতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের অবস্থাও একইরকম। আমেরিকার তাঁবেদার হলো পাকিস্তান। রাশিয়ার ভারত। আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র বিক্রি করে আর সোভিয়েত ভারতকে। লাটিন আমেরিকাতেও মার্কসবাদী ভাইরাসটি ছড়িয়ে দেওয়া হলো। চিলি, এল সালভাদোর, নিকারাগুয়া, কলম্বিয়া কেউ বাদ গেল না। কিউবা তো বিপ্লব করেই ফেলল। বুর্জোয়া শিরোমণি আমেরিকা থেকে যে দেশটি ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকে। কী দাপট! কী দাপট! সিংহের নাকের ডগায় ইঁদুরের কেত্তন। বিপ্লব চলতে লাগল। ফিদেল কাস্ত্রোর জিগরি দোস্ত চে গুয়েভারা বলিভিয়া ছুটলেন। বিপ্লব করতে সিয়া তথা কমিউনিস্ট বিরোধী জুন্টা তাঁকে ঘিরে ফেলল। চরম অত্যাচার করে তাঁকে হত্যা করা হলো। কিন্তু কমরেড চে-র শেষ মুহূর্তের কথাবার্তা, তাঁর বীরোচিত মনোভাব ইত্যাদি খুঁটিনাটি ছবি-সহ খোদ আমেরিকা প্রকাশ করে দিল। একেই বলে নিখুঁত পরিকল্পনা। রাতারাতি আর এক মহাবীরের জন্ম হলো। টি শার্টে টুপিতে ছড়িয়ে দেওয়া হলো তাঁর বীরোচিত, সুদর্শন মুখমণ্ডল। কারা করল? সেই আমেরিকা। বর্তমানের বুর্জোয়া শিরোমণি! ব্রিটেনের গর্ভ থেকেই যার জন্ম। কি বন্ধু মাথা ঝিম ঝিম করছে না? এবার যদি কেউ মুখ ফসকে বলে ফেলে ইউরোপের অন্যান্য দেশ মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অশান্তি তথা গৃহযুদ্ধ ছড়ানোর জন্যই এই তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থগুলি যাদের নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা চলে না, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লাটিন আমেরিকা, এশিয়া-সহ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলি যতই নিজেরদের সমস্যায় জর্জরিত হবে, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হবে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের অস্ত্র ব্যবসার মুনাফা ততই গগনচুম্বী হবে। শুধু কি তাই? সেই জামাই বাবাজি আবার পরিষ্কার করে বললেন প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবটি ব্রিটেনেই হবে। কারণ শিল্পবিপ্লবের উপর ভিত্তি করে এই দেশটিই বিশ্বের প্রথম ধনতান্ত্রিক দেশ হবে যেখানে বুর্জোয়া তথা মালিক শ্রেণীর বিপরীতে বিপ্লবী চেতনায় বিশ্বাসী একটি প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হবে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ভাবুন কাণ্ড! আপনার পাড়ায় আশ্রয় দিয়েছেন ভালো কথা, কিন্তু ডাকাতিটা আগে আপনার বাড়িতেই করব, তারপর বাকি পাড়া! (যদিও মার্কস সাহেবের এই ভবিষ্যৎ বাণীটি সফল হয়নি। সে নিয়েও অনেক গাদাগুচ্ছের লেখালেখি হয়েছে।) কী বললেন? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে? মানতে পারছেন না? তবে আপনার সামনে আর একটি মাত্র পথ খোলা আছে। আপনাকে স্বীকার করতে হবে বুর্জোয়ারা, সাম্রাজ্যবাদীরা, মোটেই রক্তচোষা নয়, নিষ্ঠুরও নয়— ওরা মহান, আহাম্মক এবং মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় গাধা। নইলে কেউ সবচেয়ে বড় শত্রুটিকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়ে এমন জামাই আদরে রাখে! এটাও মানতে কষ্ট হচ্ছে! বেশ, তবে কানে কানে একটা হাতে গরম নমুনা দিয়ে দিই— ভাইরাস কারা বানায় বলুন তো? ধুত্তোরি, কাফ ভাইরাস নয়, কম্পিউটার ভাইরাস। বলুন দেখি কারা বানায়। অ্যান্টি ভাইরাস কোম্পানিগুলো! ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন।

(পরবর্তী অংশ ২০.৮.২০১৮ সংখ্যায়)

লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনবে

সৌমী দাঁ

'লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত আইন-২০১৩' নিয়ে কিছু কথা সবার অবগতির জন্য বলা জরুরি। এটি পরিচিত লোকপাল অ্যাক্ট নামে। ২০১১ সালের ২২ ডিসেম্বর এটি লোকসভায় পেশ করা হয় এবং ২৭ ডিসেম্বর লোকসভায় স্বীকৃতি পায়। তারপর সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত করে এটি শেষ পর্যন্ত ২০১৩-র ১৭ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পাশ হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ২০১৪-র ১ জানুয়ারি এতে স্বাক্ষর করেন। ১৬ জানুয়ারি থেকে এটি বলবৎ হয়।

সংসদে এই বিলটির প্রস্তাব আসে সমাজকর্মী আন্না হাজারের প্রচেষ্টায়। বর্তমানে সব বিলের মধ্যে এটি সর্বাধিক আলোচিত ও বিতর্কিত বিল। প্রচারমাধ্যম ও জনগণের মধ্যে বহুলভাবে আলোচিত এই বিল। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী কর ফাঁকি, অপরাধ এবং দুর্নীতির নিরিখে ভারত বিশ্বের ৯৫তম দেশ। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এতটা দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত।

লোকপাল ও লোকায়ুক্ত নাম দুটির উৎস সংস্কৃত শব্দ লোকপালক থেকে। লোক অর্থাৎ জনগণ এবং পাল অর্থাৎ পালক — ইংরেজিতে প্রোটেক্টার বা কেয়ারটেকার থেকে। লোকপাল মানে জনগণের রক্ষাকর্তা। আর লোকায়ুক্ত এমন একটি বিচারকল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে জনগণ তাদের অভিযোগ জানাতে পারবে। লোকপাল ও লোকায়ুক্তর ধারণা ও প্রস্তাব প্রথম আসে ১৯৬৩ সালে সংসদের তৎকালীন সদস্য লক্ষ্মীমল সিঙভির হাত ধরে। ১৯৬৩ সালে মোরারজী দেশাইকে নিয়ে গঠিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফরমস কমিশনের মিটিংয়ে লোকপাল ও লোকায়ুক্ত গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সংসদে তা জমা করা হয়।

সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা চালু করা হয় ১৯৭১ সালে 'মহারাষ্ট্র লোকায়ুক্ত ও উপলোকায়ুক্ত অ্যাক্ট' নামে। যদিও অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল, জম্মু-কাশ্মীর, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে এখনও এই আইন চালু হয়নি। ১৯৬৮ সালে এটি প্রথম লোকসভায় আসে কিন্তু নানা কারণে তখন পাশ হয়নি। অবশেষে ২০১০ সালে এটি ড্রাফট বা খসড়া তৈরি করে মন্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিন্তু সব জায়গা থেকেই খারিজ হয়ে যায়।

এই রকম পরিস্থিতিতে ২০১১ সালের ৫ এপ্রিল আন্না হাজারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন শুরু করেন এবং সরকারকে এই বিল পাশ করানোর জন্য ও ওমবুডসম্যান গঠন ও লেজিসলেশন তৈরি করতে বাধ্য হয়। ৯ এপ্রিল এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়। আন্না হাজারেও অনশন ভঙ্গ করেন।

এই বিল বা আইনটির প্রধান বিষয় ও উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার থেকে দেশকে বাঁচানো স্বচ্ছতা বজায় রাখা। বিভিন্ন অসাধু আমলা, মন্ত্রী ও সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার থেকে দেশের জনগণকে বাঁচানো ও স্বচ্ছতা রক্ষা করা। দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচার করা।

বিলটি প্রস্তুত করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ে, প্রশান্ত ভূষণ এবং তৎকালীন আর টি আই বিশেষজ্ঞ

অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই বিল পাশ করানোর জন্য বহু ব্যক্তি-- কিরণ বেদি, মল্লিকা সারাভাই, স্বামী অগ্নিবেশ, শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর আন্না হাজারেকে সমর্থন করেছিলেন।

লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইন-২০১৩ ঃ এর বলে সমগ্র ভারতবর্ষ এই আইনের আওতায় আসে। ভারত ও ভারতে বাইরে যেসব সরকারি কর্মচারী কাজ করেন তাঁরা সবাই এই আইনে আওতায় পড়বে। এই আইনে মুখ্যত এটাই ঠিক হয় যে, লোকপাল গঠন হবে প্রধানত ইন্ডিয়ান টেরিটরি ইউনিয়নের জন্য। সেরকম কেন্দ্রের বিষয়গুলিও লোকপালের বিচারাধীনে আসবে। আটজন সদস্য নিয়ে লোকপাল গঠন হবে। এর মধ্যে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। সদস্যদের মধ্যে ৫০/ জুডিশিয়াল সদস্য হতে হবে। অর্থাৎ বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন। বাকি ৫০/ নন জুডিশিয়াল সদস্য তাঁদের অবশ্যই এসসি/এসটি/ওবিসি/ মাইনরিটি কমিউনিটির হতে হবে। এরমধ্যে একজন সদস্য মহিলা হতে হবে।

কারা এই লোকপালের আওতায় পড়বে ঃ

প্রধানমন্ত্রী, সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা , এ বি সি ক্লাস এবং ডি গ্রুপের কর্মচারীরা এই আইনের আওতায় আসবেন। এছাড়া যেকোনও ব্যক্তি যিনি কেন্দ্র সরকারের কোনও সংস্থা বা অফিসে কাজ করেন বা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত বা কেন্দ্রীয় সরকার যুক্ত আছে এরকম কোনও অর্থনৈতিক সংস্থা বা অফিসে কর্মাধীন, তাঁরা যদি ঘুষ নেন বা অনৈতিক কাজ করেন তাঁরা লোকপালের আওতায় পড়বেন।

তবে এরকম কোনও কাজ যা কিনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে বা মহাকাশ গবেষণায় ও অ্যাটোমিক এনার্জির সঙ্গে যুক্ত তা লোকপালের আওতার বাইরে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় সদস্য এগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁদের বিরুদ্ধে লোকপাল আইন বিচার করতে পারবে না।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের জন্য লোকপালের সমস্ত সদস্যের সম্মতি এবং তদন্তের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যে সম্মতি প্রয়োজন। তাছাড়া সংবিধানের ১০৫নং ধারায় বর্ণিত কোনও কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির কাজ এই লোকপালের আওতায় আসবে না। যেমন সংসদে যদি কোনও কিছুতে তিনি ভোটদান করেন বা বক্তব্য রাখেন।

লোকপালের অধীনে তিনটি অফিস থাকে বা তিনটি অফিসের সহায়তায় লোকপাল তার বিচার পদ্ধতি সম্পন্ন করে। প্রথমটি সহায়ক অফিস বা সেক্রেটারি টু লোকপাল, দ্বিতীয়টি এনকোয়ারি অফিস বা ডাইরেকটর অব এনকোয়ারি এবং তৃতীয়টি প্রসেক্যুশন অফিস।

কোনও অভিযোগ দাখিলের পর লোকপাল প্রথমে সিদ্ধান্ত নেবে সেই অভিযোগ তাদের বিচারাধীন কিনা অথবা তা লোকপালের আওতায় আসে কিনা। এরপর অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হলে সেটি এনকোয়ারির জন্য নেওয়া হয়। এনকোয়ারি অফিস প্রথম তা এনকোয়ারি করে। অনেক সময় নিজস্ব তদন্ত শাখা এই কাজটি করে অথবা কোনও এজেন্সি যেমন, দিল্লি স্পেশ্যাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট(সি বি টি)-এর হাতে এনকোয়ারি তুলে দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্ত ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে অভিযোগ দাখিলের দিন থেকে। যদি শেষ করা না যায় আরও ৯০ দিন সময়সীমা বাড়ানো যায়। অর্থাৎ ছ'মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করতেই হবে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে অভিযোগ পত্রের সত্যতা প্রমাণিত হলে পরবর্তী পর্যায়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদি অভিযোগটিতে গ্রুপ এ থেকে গ্রুপ ডি-র অফিসাররা যুক্ত থাকেন তখন সেটি সি ভি সি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। সি ভি সি-র তদন্তের পর অভিযুক্তের দোষ ধরা পড়লে তার এনকোয়ারি রিপোর্ট লোকপালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদি গ্রুপ সি এবং ডি-র অফিসার দোষী সাব্যস্ত হয় সি ভি সি নিজেই পরবর্তী বিচারকার্য ঠিক করে।

এই বিচারব্যবস্থায় অভিযুক্ত যদি দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে লোকপাল সেটিকে তার প্রসিক্যুশন উইংয়ের হাতে তুলে দেয় এবং চার্জশিট গঠন করা হয় বা অনেক সময় ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংসের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে, যদি অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখন স্পেশ্যাল কোর্ট গঠন করে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে বিচার হয় মিথ্যা অভিযোগের জন্য। এই আইন অনুযায়ী কোনও অপরাধ ঘটার সাত বছরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

লোকপাল দোষী ব্যক্তির বিচারের দায়িত্ব অনের সময় স্পেশ্যাল কোর্ট গঠন করে তার হাতে তুলে দেয়। দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই স্পেশ্যাল কোর্ট সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং প্রিভেনশন অব করাপশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার প্রাপ্য শাস্তি ঘোষণা করবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো হয় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর-১৯৭৩ অনুযায়ী। লোকপাল অ্যাপিলেট অথরিটি হিসেবেও কাজ করে।

লোকায়ুক্ত ঃ লোকায়ুক্ত হলো রাজ্যের জন্য লোকপালের কাউন্টারপার্ট। প্রতটি রাজ্যকে এর অন্তর্গত একটি করে লোকায়ুক্ত গঠনের নির্দেশ দেওয়া আছে। প্রতিটি রাজ্য নিদেদের মতো করে লোকায়ুক্ত গঠন করবে। কিন্তু এখনও সব রাজ্যে এটি গঠন হয়নি। গত ২৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় এই লোকায়ুক্ত বিল পাশ হয়। যদিও মুখ্যমন্ত্রকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। রাজ্যের ৫৮টি দপ্তরকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে। কেন্দ্রের তালিকায় থাকা সমস্ত বিষয়কেই লোকায়ুক্তের আওতায় আনা হয়েছে।

(লেখিকা পেশায় আইনজীবী)

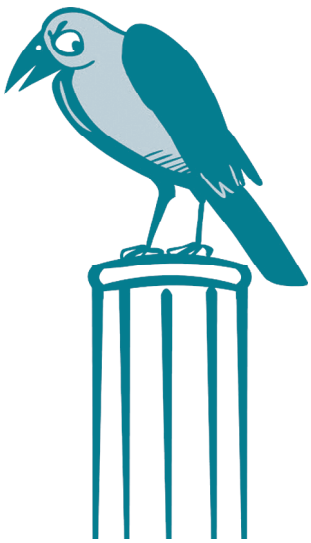

রাহুল বলে বাহু তুলে নেচে নেচে আয়

এক সময় প্রেমের বন্যায় 'শান্তিপুর ওই ডুবুডুবু সোনার নদে ভেসে যায়' অবস্থা হয়েছিল। তখন সকলের মুখে একটিই বুলি, 'হরি বলে বাহু তুলে নেচে নেচে আয়।' বর্তমান ভারতে আবার সেই বন্যার প্রবল বেগ দেখা দিয়েছে। এবং স্বয়ং কংগ্রেসের কর্ণধার এখন প্রেমাবেগে চঞ্চল হয়ে বিরোধী দলের 'মওত কা সওদাগর'কে জড়িয়ে ধরে তান ধরেছেন— 'মেরেছো কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।' এবং তারপরেই স্বভাবের বশে, পার্লামেন্টে প্রকাশ্যভাবে চোখ মেরেছেন। আহা যেন প্রেমের চোখমারা অবতার।

সংস্কৃত একটি আপ্তবাক্য আছে— অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে, অথবা নরবাহনে, ইতরজন ন সজ্জনায়তে। আমাদের এই নায়কপ্রবর কবে থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের সেবায় নবযুগ সৃষ্টির অপেক্ষায় অ্যাপ্রেনটিসগিরি করছেন, কিন্তু কিছুতেই আর এই ইটালিয়ান বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে না। পারিবারিক জমিদারি কংগ্রেস পার্টির মদতে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, এই লিলিপুট নেতা যতই বন্দেগি জাঁহাপনা, মোসাহেবদের উৎসাহী করতালিতে গোলিয়াথ হওয়ার চেষ্টা করেন, ততই ধেড়িয়ে পড়েন। কিন্তু পার্টির ঘাড়নাড়া মোসাহেববৃন্দের হাততালির আর শেষ নেই, কেননা তেনাদের মহতী আশারও শেষ নেই যে, রাহুল বাবা পার করে গা।

এই রাহুলবাবার অবশ্য গুণপনার কোনও শেষ নেই। দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতে রাজনীতিতে যোগদান করেই তিনি গুংগা বলে হেঁকে উঠলেন, যেন ইচ্ছে করলেই যে কোনওদিন তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। এটি যেন তাঁর ছেলের হাতের মোয়া। নেহাতই তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের মতো রাজ্যলোভী নন, তাই তিনি অপেক্ষায় ছিলেন, 'সময় যেদিন আসিবে সেদিন যাইব তোমার কুঞ্জে (বাদশাহি তখতে)।' এই ত্যাগী মহাপুরুষের মুখে আরও একটি বাণী শোনা গেল, ভারতত্রাতা গান্ধী পরিবারের কেউ প্রধানমন্ত্রী থাকলে, অর্থাৎ স্বয়ং তিনি সেদিন থাকলে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না।

এইসব মহাবাক্য শ্রবণ করেই বোধ হয় গান্ধী কংগ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের (জনপথে সীমাবদ্ধ) বশংবদ মনসবদাররা তাঁদের আশার প্রদীপকে নানান বেশে সাজিয়ে লোকের মন ভোলাবার জন্য অতি তৎপর। কেননা এই গান্ধীকুলতিলকই তাঁদের অগতির গতি। সেই জন্যেই তিনি যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কংগ্রেস সভাপতির চেয়ার দখল করলেন, তখন কংগ্রেসি বনিতাদের উলুধ্বনির আর বিরাম নেই। তার কারণ ব্যাখ্যা করে, বিশিষ্ট বুজুর্গ আইয়ারজী তো স্পষ্টই বলে দিলেন, শাহাজাহানের পর ঔরঙ্গজিব যে মসনদে বসবে সেটিই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক কথাটি উচ্চারণের ফলে অস্বাভাবিকভাবে তাঁর নাককাটা গেল। এখন তিনি নাকের বদলে নরুন পেলুম, টাক ডুমা ডুম বলে ডুগডুগি বাজাচ্ছেন।

আমাদের নবযুগের এই ঔরঙ্গজিবের ভাবমূর্তি বিকশিত করার জন্যে কতই না মেহনতি আয়োজন। কিন্তু মুশকিল হলো, ঘষে মেজে রং, আর ধরে বেঁধে পিরিত করতে গেলে যে উলটো উৎপত্তি হয় সেকথার খেয়াল থাকে না। তাই আমাদের এই নব অবতারের প্রথমে ঘষে মেজে মহান নেতার রং করার পর এখন হয়েছে ধরে বেঁধে পিরিতির পালা। ইমেজ মেকওভারের জন্যে, রাখালি কত খেলাই দেখালি। পূর্বসূরি নেহরু সাহেবের মতো Discovery of India করতে গিয়ে দলিতদের কুটিরে গিয়ে দরিদ্রবান্ধবের ভূমিকায় তিনি প্রথমেই এক অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হন। তারপর তিনি মোহনসিরিজের নারী ত্রাতা মোহনের ভূমিকায়। Women's emancipation-এর জন্যে হন্যে হয়ে ওঠেন।

বোফর্সসতীর সন্তান হওয়ার ফলে তিনি স্বভাবতই ন্যায় ও সততার প্রতীক। কেবল ন্যাশনাল হেরাল্ডের জোচ্চুরির জন্য অভিযুক্ত হয়ে, এখন আদালতের বেল পেয়ে ছাড়া আছেন, এই যা। সেই তিনি একদিন তাঁদের পার্টির প্রধানমন্ত্রীর জারি করা অর্ডিন্যান্স হঠাৎ মহাবিপ্লবী হয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমি এটি এখনই ছিঁড়ে ফেলতে পারি। সেদিন কিন্তু কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি যে, তুই কে রে হরিদাস পাল, অর্ডিন্যান্স ছিঁড়ে ফেলার। তার কারণ সকলেই জানেন, তিনি হলেন সিংহির মামা ভোম্বল দাস, সুপার প্রধানমন্ত্রী ইতালিয়ান গান্ধীর ভবিষ্যনিধি। সুপার প্রধানমন্ত্রীই নাকি এই কৌশলটি গ্রহণ করেন, বাছাধনের বিপ্লবী ইমেজবৃদ্ধির জন্য।

আসলে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের নির্বাচনপ্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার জন্যে যখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসে তখন ভোটব্যাঙ্কে ও অশুভ আঁতাতের স্বার্থে তাকে নাকচ করতে গিয়ে তড়িঘড়ি

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহকে দিয়ে অডিন্যান্স জারি করা হয় সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে। ঠিক যেভাবে শাহবানো মামলায় ধর্মান্ধ মুসলমানদের তোষণে সংবিধান সংশোধন করা হয়। কিন্তু এবারে দুর্নীতিগ্রস্তদের তোল্লা দেওয়ার জন্য অর্ডিন্যান্স জারিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই অর্ডিন্যান্সটি নস্যাৎ করার জন্য, মহান বিপ্লবীর ভূমিকায় কংগ্রেসি নবকুমার, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তার বিরুদ্ধে যান, যেন সব দোষ প্রক্সি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের। এই জন্যেই মনমোহন সিংহের কোনও সদর্থক ভূমিকাকেই আমল দেওয়া হয় না, যদি তা গান্ধীপুঙ্গবের ইমেজের ক্ষতি করে।

আসলে জনপথ কংগ্রেসের এখন মহান উদ্দেশ্য হলো এই কুলার্ণবের ইমেজ মেরামত করতে পারলে সে একদিন মহাধনুর্ধর নেতারূপে উদিত হতে পারে। এবং সেজন্য বশংবদ পার্টিম্যান তথা এক শ্রেণীর মিডিয়ার অক্লান্ত চেষ্টার আর শেষ নেই। ভেকধরারও শেষ নেই। ইমাম-পিরদের পাদোদক খাওয়া সেকুলার পরিচয় যখন ভোটে আর সুবিধে করতে পারছে না তখন আসে হিন্দু ভেক ধরার পালা। মুসলমানদের নাতি ও ক্রিশ্চানের সেকুলার সন্তান হঠাৎ উপবীতধারী শিবভক্ত হয়ে ধোয়া বিল্বপত্র হয়ে দেখা দেন। তারপর এখন আবার নতুন স্ট্র্যাটেজিতে প্রেমদাতা নিতাই সেজে বিসদৃশভাবে গায়ে ঢলে পড়া ও পরে চোখ মারার কেরামতি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

ছোটোবেলায় আমরা চালিয়াত চন্দরের গল্প পড়েছি, এখন দেখি চ্যাংড়াচন্দরের পাপ্পুকে ঝাপ্পি। 'মিশর কুমারী' নাটকে প্রেমরোগীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবে সরকারের বিরুদ্ধে চোখা চোখা অগ্নিবাণ ঝেড়ে ঘন ঘন হাততালি পাওয়া জমেছিল বেশ। কিন্তু হঠাৎ কী করে প্রেম বাসনা চাগিয়ে উঠল, কে জানে। হঠাৎ উফ করে এক লাফে বিপরীত দিকে বসা প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরার কী করুণ

আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু অভিসন্ধিপরায়ণ মিডিয়াম্যান এটিকে একটি গ্লোরিয়াস রেভল্যুশন বলে অভিহিত করে, অর্বাচীন বালকবীরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই সজ্ঞান বুদ্ধিভ্রম দেশের সুস্থ রাজনীতি গড়ে ওঠার পক্ষে মারাত্মক।

অপচেষ্টা। হঠাৎ সংসদের মর্যাদাভঙ্গকারী এই চ্যাংড়ামির দৃশ্যে অনেকেই হতবাক হলেও, স্পিকার সুমিত্রা মহাজন কিন্তু এহেন কাণ্ডজ্ঞানহীন কুৎসিত কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করতে ভোলেননি।

কিন্তু পরিহাসের বিষয়, বালখিল্য অনুরাগী একশ্রেণীর মিডিয়া মাতব্বর এটিকে একটি মহান ভালোবাসাবাসির উদ্যোগ বলে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁদের মতে রাজনীতির অঙ্গনে এখন এইরকম প্রেম জানানোর চালাকির দ্বারা কাজ সমাধা করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ যাই বলুন, এখন এই চালাকির দ্বারাই মহা মহা কাজ হাসিল করতে হবে। তার থিম সঙ হবে রজনীকান্তের সেই 'যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাসি সেথা যেতে মন চায় মা।' লোক চাক আর না চাক ছিনে জোঁকের মতো লোকের গায়ে জোর করে ঢলে পড়তে হবে। তবেই মিডিয়াম্যানদের 'হোক লদকালদকি' আন্দোলন সফল হবে।

মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, সংসদের এই প্রগতিশীল 'হোক আন্দোলনে' একদিন ফিরোজ গান্ধী সরকারের সমালোচনা করার পরেই নেহরুকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকের রক্তগোলাপটি নিজের বুকপকেটে লাগিয়ে দিচ্ছেন; অটলবিহারী বাজপেয়ী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে জড়িয়ে ধরছেন; লালকৃষ্ণ আদবাণী অভিমানশূন্য, বিদ্বেষশূন্য পাপ্পু রাদু কা ঝাপ্পিতে প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে বলছেন, উঠো, উঠো হোক আলিঙ্গন। ধৃষ্টতার যেন কোনও সীমা নেই।

কংগ্রেসের কোন গর্দভীবুদ্ধি থেকে এই 'হোক আলিঙ্গন' ফর্মূলার দ্বারা অপোগণ্ড গান্ধীর ইমেজবৃদ্ধির পরিকল্পনা কে জানে। যে নরেন্দ্র মোদীকে দিনরাত 'মওত কা সওদাগর' না বলে যে বিজাতীয় মাতাপুত্র জলগ্রহণ করতেন না তারা আজ ভালোবাসার শূন্যতার প্রমাণ দিতে বিসদৃশভাবে আলিঙ্গনের গান্ধীগিরির আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তাতে শুধু ড্রামাবাজির অন্তঃসারশূন্যতা নগ্নভাবে ধরা পড়ে। কোলাকুলি করে সাধু সাজার পর, চোখ মারার ইঙ্গিতে খলতাকে আর কিছুতেই চাপা দেওয়া যায় না। এইসব ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোর চেষ্টাতে কিন্তু কিছু অতিবুদ্ধিমানকে চোখ ভোলানো গেলেও সাধারণ বুদ্ধিকে ভোলানো যায় না।

সংসদকক্ষে অকারণ এই অশিক্ষিত অল্পবুদ্ধির প্রেমবিতরণের ভণ্ডামি কিন্তু সংসদের মর্যাদাকেই কলুষিত করে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু অভিসন্ধিপরায়ণ মিডিয়াম্যান এটিকে একটি গ্লোরিয়াস রেভল্যুশন বলে অভিহিত করে, অর্বাচীন বালকবীরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই সজ্ঞান বুদ্ধিভ্রম দেশের সুস্থ রাজনীতি গড়ে ওঠার পক্ষে মারাত্মক।

এই বিভ্রমের ফলেই পদে পদে সেকুলারিজমের সজ্ঞান বিচ্যুতিতে দেশে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা গড়ে উঠতে বাধা পায়। সিউডো সেকুলারিজম মোল্লাতোষণের ধ্বজাধারী হওয়ার ফলেই যেমন সংবিধানের Preamble-এ সেকুলার কথাটি জোর করে যোগ করেও সমস্যা ঘনীভূত হয়। তেমনি সংসদীয় আচরণের বিরুদ্ধে প্রেমবিতরণকে সমর্থন করলে, তার বিষময় ফল ফলতে দেরি হবে না। তাই বলি, অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি।

গ্রামপঞ্চায়েতে পুকুরচুরি

সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষে বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো যখন নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে তখন বিগত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েত দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বি.ডি.ও.-দের কোটি কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ জাতীয় স্ব-রোজগার যোজনার একশো দিনের কাজের পুকুর চুরির ঘটনার কথা অপ্রকাশিত রয়েছে। সবাই জানি কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতির কথা ভেবেই একশো দিনের কাজের টাকা সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু পঞ্চায়েতগুলোতে কাজ না করেই মাস্টার রোল তৈরি হচ্ছে এবং জব কার্ড হোল্ডারদের অল্প কিছু টাকা দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা উপরে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি মালদা জেলার ইংলিশ বাজার ব্লকের যদুপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর শ্মশান ঘাটের সংস্কারের জন্য দুই লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছেষট্টি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু সেই শ্মশানে কোনও প্রকার কাজ না হয়েই একটি বোর্ড টাঙানো হয়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে দু' লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশো ঊনপঞ্চাশ টাকা খরচ হয়েছে এবং আঠারো হাজার দুশো সতেরো টাকা ফেরত গেছে। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং বি.ডি.ও.-র কাছে তদন্ত দাবি করেছেন। আমার জানা এমন বহু পঞ্চায়েতে কোটি কোটি টাকা একশো দিনের স্কিম খাতায় কলমে দেখিয়ে প্রধান, অন্যান্য আধিকারিক ফুলে ফেঁপে উঠছেন। আর কিছু দিনের মধ্যেই যেহেতু নতুন পঞ্চায়েত গঠন করা হবে, তাই এখন বলা হচ্ছে (জেলা শাসক মারফত) তাড়াতাড়ি মাস্টার রোল তৈরি করে পাঠাতে হবে, কাজ হোক আর নাই হোক। যেখানে জেলা প্রশাসন দেখাতে পারবেন একশো দিনের কাজের সব টাকা শেষ করে দিতে পেরেছি। এভাবে দুর্নীতি করে রাজ্য সরকার একশো দিনের কাজে ও স্বচ্ছ নির্মল বাংলা মিশনে দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থান দখল করেছে। জনগণকে বোকা বানিয়ে জনগণের করের টাকায় ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করে আর কতদিন ভোট ব্যবসা চলবে?

—তরুণ কুমার পণ্ডিত,
কাঞ্চনতার, মালদা।

ধর্মীয় সভায় রাজনৈতিক প্রচার

ধর্মীয় সভায় সাধারণত উদ্দিষ্ট ধর্ম, তার প্রবর্তক, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁর রচনা এবং বর্তমান দেশ-সমাজ-সংসারে সেইসব বাণী ও রচনার উপযোগিতা নিয়ে চর্চা হয়। এর ফলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ উচ্চভাবে উন্নীত হয়, তাদের সৎভাব চর্চার প্রেরণা জাগে। দেশ ও সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করার ভাবনায় নিজেরা উদ্‌বোধিত হয়। ধর্মসভার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এখানেই। তাই ধর্মসভার সুদূর প্রতিক্রিয়ার কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। সমাজ-সংসারের এক মহৎ উদ্দীপক এ ধর্মসভা।

সম্প্রতি কলকাতা ময়দানে একটা বৃহৎ 'ধর্মীয় সভা' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এখানে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সবধরনের ধারণার বাইরে। যতরকম মিডিয়া আছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ও মন্তব্য বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিকভাবে তিনি গরিষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন। তাই সেসবের

হিন্দুধর্মের এই উচ্চ ও সামাজিক ন্যায়বোধই সংকীর্ণভাবে ক্লিষ্ট চেতনা ও প্রচার থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতকে এক উন্নত মানবিক, বোধে উদ্‌বোধিত করবে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

চিঠিপত্র

উদ্ধৃতি এখানে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এই ভাষণের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মনের যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে, তা গভীর উদ্বেগ ও চিন্তার বিষয়। ভারতের প্রান্তিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথায় পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ খুবই মর্মাহত। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে সমদর্শিতা দেখাতে পাওয়া যায়নি! তাঁর বক্তব্য ধর্মীয় উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে, রাজনৈতিক পরিবেশ অবনতির দিকে চলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে সেই সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ ধর্মের মানুষ নিজধর্মের বাইরে অন্য কোনো ধর্ম, সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা পোষণ করে না! তাদের ধর্মচর্চা, সভাসমিতি অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না! সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষকে তারা ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনের অঙ্গ বলেই জানে। তারা তাদের পূর্ব পুরুষের শিক্ষা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ 'সমস্ত পৃথিবীই আমাদের আত্মীয়' বলে জানে। তারা জানে 'সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু' অর্থাৎ 'সকলের কল্যাণ' হোক্। এই রকম উদারচিত্ত ধর্মের মানুষ জনের কাছে 'ধর্মীয় সমাবেশে' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য গভীর বেদনাদায়ক।

হিন্দুধর্মের এই উচ্চ ও সামাজিক ন্যায়বোধই সংকীর্ণভাবে ক্লিষ্ট চেতনা ও প্রচার থেকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতকে এক উন্নত মানবিক, বোধে উদ্‌বোধিত করবে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

—রণজিৎ সিংহ,
কলকাতা-৭০০০৩৬।

কর্মবীর প্রয়াত রাধাগোবিন্দ পোদ্দার

স্বস্তিকার ১৮ জুন, ২০১৮ তারিখের সংখ্যায় প্রয়াত প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিদ্রোহী কুমার

সরকারের স্মৃতিচারণ আমার মধ্যেও কিছু স্মৃতি উসকে দিল। তাই এই পত্রের অবতারণা।

সাল তারিখ মনে নেই, তবে তখন গোবিন্দদা হুগলী জেলা প্রচারক হিসেবে জেলাকেন্দ্র শ্রীরামপুর নিবাসে রাত্রিযাপন করতেন। সঙ্ঘের কাজে ভোর হতেই বেরিয়ে পড়তেন আর অন্তত রাত্রি দশটার আগে ফিরতেন না। নিবাসটি ছিল স্টেশন সন্নিহিত গোস্বামী পাড়ায়। ওই পাড়ারই বর্ধিষ্ণু পরিবারের এক সন্তান ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) যুব নেতা। নিবাসের মালিক নিপাট ভালোমানুষ। একদিন ওই নেতা বাড়ির মালিক ভদ্রলোককে ডেকে বললেন, 'আর এস এস-কে বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন কেন? তুলে দিন। নইলে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন।' বাড়ির মালিক ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল প্রতিদিন রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া আর ভোরে ওঠা। সেদিন ওই কথা শোনার পর ভদ্রলোক আর শুতে যেতে পারেননি। জেগে গোবিন্দদার অপেক্ষায় বসে আছেন। গোবিন্দদা যথারীতি রাত দশটার পরে ফিরলেন। ভদ্রলোক এসে গোবিন্দদাকে সব জানিয়ে বললেন, 'আপনাদের তো আর রাখতে পারছি না।' গোবিন্দদা উত্তরে বললেন, 'তিনি কেন আপনাকে বলেছেন? তাঁকে বলবেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে। আমার নাম রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। জানেন, আমি একটা বাঁশি বাজালে এখুনি পাঁচশো ছেলে ছুটে আসবে।' বলে পকেট থেকে সঙ্ঘের আজ্ঞা দেওয়ার বাঁশিটা বের করে বাড়ির মালিককে বললেন, 'দেখবেন বাজাব বাঁশি?' ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে বললেন, 'না, না, এই রাতবিরেতে এত হাঙ্গামার দরকার নেই।' এই বলে তিনি আর কথা না বাড়িয়ে পরের দিন যাঁর নামে বাড়ি ভাড়া নেওয়া ছিল অর্থাৎ তাঁর বন্ধু তৎকালীন শ্রীরামপুর নগর সঙ্ঘচালক পেশায় আইনজীবী জগত্তারণ লাহিড়ীকে সব জানালেন। শুনে জগত্তারণদা বললেন, 'গোবিন্দ তো ঠিকই বলেছে, আমিও এখন থেকে প্রতিদিন দু'বেলা নিবাসের সামনে দিয়ে যাব।' ওই কমিউনিস্ট নেতার নাম করে বাড়ির মালিককে বললেন, 'তাকে বোলো সঙ্ঘের নিবাসে হামলা করার আগে সে যেন আমার মাথায় ঢিল ফেলার সাহস দেখায়।'

সেদিন এই ঘটনা পরম্পরা আমাদের মতো কিশোর স্বয়ংসেবকদের খুব প্রেরণা জুগিয়েছিল। আজ পরিণত মাথায় ভাবি— গোবিন্দদা ওই কমিউনিস্ট নেতার বিরুদ্ধে পাঁচশো ছেলে দাঁড় করানোর কথা কোন শক্তির ওপর নির্ভর করে বলেছিলেন? সত্যিই কি তাঁর সে ক্ষমতা সেদিন ছিল? হ্যাঁ, পঞ্চাশ/একশো তরুণ স্বয়ংসেবক জোগাড় করতে তিনি পারতেন। তাহলে?

উত্তরটা পেলাম পরবর্তীকালে আমার দেখা একটি ঘটনায়।

শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় তখন একজন ডাক্তারবাবুর বাড়ি ও চেম্বার ছিল। ডাক্তার ভদ্রলোক বামঘেঁষা মানুষ। সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পরে শখের ডাক্তারি করেন। যত সমবয়স্ক বা আরও বৃদ্ধদের নিয়ে চেম্বারে জমিয়ে আড্ডা চলে আর তার ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারি। সামান্য পয়সায় ভালো ওষুধ দেন বলে রোগীর ভিড়ও কম হতো না। কিন্তু ওষুধ পেতে রোগীদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো। সেদিন আমিও ওষুধ নেওয়ার জন্য বসে আছি। এমন সময় ওই তরুণ কমিউনিস্ট নেতা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকলেন। তাকে দেখেই স্বাগত জানিয়ে ডাক্তারবাবু সমবেত বয়স্যদের বললেন, 'রাশিয়া গিয়েছিল।' বয়স্ক ব্যক্তিরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে গিয়েছিলে? কিরকম সব দেখলে টেখলে?' উত্তরে ওই নেতা গর্বের সঙ্গে কিছু বিবরণ দিতে লাগলেন। সবাই মন্ত্রযুদ্ধের মতো শুনছেন। এমন সময় একজন বললেন, 'তা খাওয়া দাওয়া কী করলে?' উত্তরে ওই কমিউনিস্ট নেতার স্পর্ধিত উক্তি, 'আপনারা যা নিষিদ্ধ মনে করেন, তাই খেয়ে এলুম।' ওই নেতা ভেবেছিলেন, বোধহয় এই কথা বলে খুব বাহবা কুড়াবেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। বৃদ্ধরা যেন ফেটে পড়লেন। বললেন, 'বল কী? তুমি একটা ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। তুমি গোমাংস খেয়েছ। ছিঃ ছিঃ!' উত্তরে ওই নেতা বেদ, মুনি, ঋষিদের দোহাই দিয়ে কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধদের সমবেত ধিক্কারে সুবিধে হলো না। চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবু কোনও কথা বললেন না। মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন। এখন মনে হয়, প্রয়াত গোবিন্দদা সঙ্ঘ কাজে থেকে হিন্দুসমাজের এই নাড়িটা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তিনি যে কাজ করতে নেমেছেন সেই হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার কাজে প্রত্যেক হিন্দুর মনের মধ্যে কোনও একটা গোপন স্থানে সমর্থন রয়েছে। তাই বুক ফুলিয়ে তিনি পাঁচশো ছেলে জোগাড় করার কথা বলতে পেরেছিলেন। আমাদের মধ্যে যদি কেউ বৃদ্ধ গোবিন্দদাকে খাটো করে দেখে থাকেন উপরোক্ত ঘটনা দুটি তাঁর দৃষ্টি দোষকে সংশোধন করতে সাহায্য করবে আশা করি।

আসলে সবাই গোবিন্দদা হতে পারেন না। তাই দেহপাত হলেও গোবিন্দদার মৃত্যু নেই। তাঁর কর্মপদ্ধতি অনাগত কালকেও প্রেরণা জুগিয়ে চলবে।

—অতনু ব্যানার্জি,
শ্রীরামপুর।

১৯-এর ভোটে

মোদীকে হটাতে দেশে
হলো মহাজোট
কে যে হবে রাজা শেষে
পেলে বেশি ভোট।
ছাড়বার পাত্র নয়
সবাই হবে রাজা,
কার আগে কে বা খাবে
দিল্লির খাজা।
মায়াবতী কেজরি শেষে
কংগ্রেস
জানি না চলবে কত
সাইকেল রেস।
এন.সি.পি. তেলুগু আর তৃণমূল
কার পাতে পড়ে শেষে
খোকসার ফুল।
জুটে যাবে কত দল এই
মহাজোটে
হবে কুপোকাত সব
১৯-এর ভোটে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

মহাকাশ গবেষণায় ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীরা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতীয় মহিলারা অনেকেই সফলতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছেন। আকাশের চাঁদ সূর্য তারার উজ্জ্বলতায় তাঁরা আলোকিত। চাঁদ তাঁদের কাছে কেবলমাত্র মামা নয়, কৃত্রিম চাঁদ বানাতেও পারদর্শিনী তাঁরা। নিজেদের একাগ্রতা এবং পরিশ্রম দিয়ে আজ তাঁরা মহাকাশের ইতিহাসে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। আরামের নিদ্রাকে তাঁরা তাঁদের জীবন থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু স্বপ্ন দেখতে কৃপণতা করেননি। আজকের এই পৃথিবীতে পরিবর্তনের উদ্দাম হাওয়ায় তাঁরা উদ্দীপিত করেছেন আরও অনেক মহিলাকে। তাঁরা শিখিয়েছেন না পাওয়ার কিছুই নেই, প্রয়োজন কেবলমাত্র অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং পরিশ্রমের। এইরকম কিছু মহিলা মহাকাশ বিজ্ঞানী, যাঁরা তাঁদের ঘর-সংসার সামলে কর্মক্ষেত্রেও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ইসরো স্যাটেলাইট সেন্টারে কর্মরত সব থেকে বরিষ্ঠ মহিলা বৈজ্ঞানিক অন্ধ্রপ্রদেশের অনুরাধা টি কে। তিনি ১৯৮২ সালে ইসরোতে যোগ দেন। তখন সেখানে মহিলা ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বর্তমানে ইসরোতে কর্মরত প্রায় ১৬ হাজার বিজ্ঞানীর মধ্যে মহিলা ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ১০-১৫ শতাংশ। পরিসংখ্যানটি একদিকে সন্তোষজনক, কিন্তু এক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি ৫০ শতাংশেরও অনেক কম। এর মূল কারণ হলো সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলাদের এমনভাবে বড়ো করা হয় যে, সংসারের কাজ করাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শ্রীমতী অনুরাধার বক্তব্য, পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে ইসরোতে তিনি ৩৪ বছর ধরে কর্মরত। পরিবার এবং রকেট বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তিনি নিজের কেরিয়ার এবং ভালোবাসার কাজ করে চলেছেন। নিজের এই সফলতায় তাঁর স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল রয়েছে। জিয়োস্যাট প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ইসরো স্যাটেলাইট সেন্টারে অনুরাধার দায়িত্ব জিয়ো সিন্‌ক্রোনস স্যাটেলাইটের ওপর কাজ করা। দূরসঞ্চার এবং ডাটালিংকের ব্যাপারে ওঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইরকম একজন বৈজ্ঞানিকের জন্য আমরা গর্ববোধ করি।

এমনই একজন মহিলা বৈজ্ঞানিক ত্রিবান্দ্রমের ললিতাম্বিকা বি. আর.। পি এস এল বি রকেটের মাধ্যমে ১০৪টি কৃত্রিম উপগ্রহের

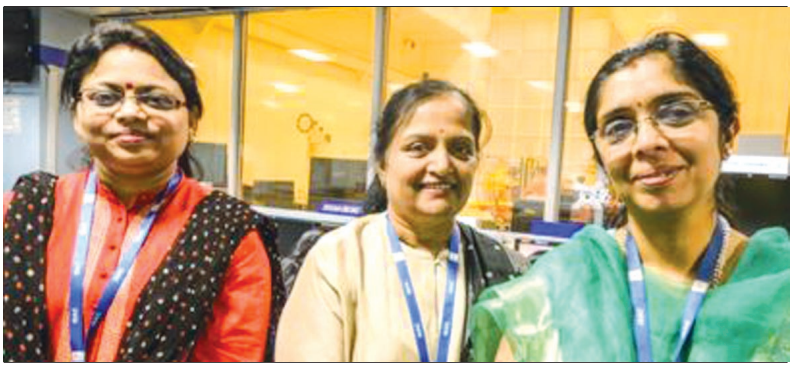

(বাঁ দিক থেকে) ঋতু করিধল, অনুরাধা টি কে, নন্দিনী হরিনাথ।

সফল প্রক্ষেপণ তাঁর এবং তাঁর দলের চূড়ান্ত সফলতার কাহিনি। আন্তর্জাতিক মহলও এই সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই কাজটি ছিল খুবই চ্যালঞ্জিং। একটিমাত্র লঞ্চ ভেহিকল (পি এস এল বি) থেকে একসঙ্গে ১০৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়ার সময় মাথায় রাখতে হয় যাতে সেগুলি নিজেদের মধ্যে ধাক্কা না খায়, এজন্য পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০৬ কিলোমিটার উঁচুতে উঠে পি এস এল বির সবকটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথক পৃথক সময়ে আলাদা করে ছাড়তে হয়। এজন্য অনেকবার কম্পিউটারে সম্ভাব্য বিপদ এবং আবহাওয়ার পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যাতে ভুল হবার সম্ভাবনা না থাকে। ইসরোতে কর্মরত ললিতাম্বিকা নিজের কাজে খুব সন্তুষ্ট এবং উৎসাহিত।

মধ্যপ্রদেশের কীর্তি ফৌজদার ইসরোতে যোগ দেন। ইসরোর যে দলে কীর্তি কাজ করেন, সেটি কৃত্রিম উপগ্রহ এবং অন্যান্য বিভাগের দেখাশুনা করে থাকে। কীর্তির মতে তাঁকে এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। বাবা মি. জৈন জানিয়েছেন যে, কীর্তি নিজেই নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অভ্যস্ত। দশম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দি মাধ্যমে পড়াশুনা করার পর তিনি বুঝতে পারেন যে, ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধাজনক। সেজন্য বাকি পড়াশুনা ইংরেজি মাধ্যমেই করেন। তিন বোনের মধ্যে সব থেকে বড় কীর্তি কেবলমাত্র নিজের বোনেদেরই নয়, ওইসব মেয়েদেরও আদর্শ যারা বৃহৎ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য একাগ্রচিত্ত।

ইসরোতে প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর রূপে কর্মরত চেন্নাইয়ের সীতা এসের বক্তব্য, উপকরণ নিয়ে খেলতে তাঁর ভাল লাগে, সেজন্য ইসরোর চ্যালেঞ্জিং কেরিয়ার তিনি বেছে নিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং প্রোজেক্টের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যেমন ইলেকট্রনিক্স, বিভিন্ন মিশনের জন্য সফট্‌ওয়ার ডিজাইন করার সুযোগ মেলে। আই আই টি বেঙ্গালুরু থেকে ইলেকট্রনিক্সে মাস্টার ডিগ্রি করে ইসরোর ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স থেকে অ্যাস্ট্রোনমিতে পি এইচ ডি করেন। তিনি বলেন যে, তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে কৃত্রিম উপগ্রহের জন্য পেলোড বানাতে থাকেন, যা খুবই রোমাঞ্চকর এবং চ্যালেঞ্জিং। সীতা এবং তাঁর টিমের কাছে চাঁদ সম্বন্ধিত মহত্ত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট চন্দ্রযান-২ (তাঁর সম্বন্ধিত ভারতের দ্বিতীয় মিশন) এবং আদিত্য (চাঁদের ব্যাপারে অধ্যয়ন করার কৃত্রিম উপগ্রহ)।

ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের অ্যাডভান্স স্টাডির ২০১০-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে বিজ্ঞানে গবেষণারত ১৪ শতাংশের বেশি মহিলা বিবাহ করেননি। অথচ সে জায়গায় অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা মাত্র ২.৫ শতাংশ। এর থেকে বোঝা যায়, মহিলাদের কতটা সমন্বয় সাধন আর সমাজের বিধি নিষেধের জাল ভেঙে বেরিয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছাতে হয়। তবু নন্দিনী হরিনাথ, এন. বলারমতী, মৌমিতা দাস, টেসি থামস্, প্রমোদা হেগড়ের মতো আকাশছোঁয়া নাম আরও আছে। সংকল্প তাঁদের সবার এক, এগিয়ে চলো এবং বদলে দাও দুনিয়ার রক্ষণশীল মানসিকতাকে। ■

অতিরিক্ত প্রোটিন খাদ্য থেকে সাবধান

সত্যানন্দ গুহ

শ্বেতসারের (কার্বোহাইড্রেট) পরেই শরীর গঠনে ও শক্তি উৎপাদনে প্রোটিনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রোটিন দু'প্রকারের। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ। ইটের গাঁথুনি দিয়ে যেমন বাড়ি তৈরি করা হয়, তেমনি প্রোটিনের সাহায্যে শরীর গঠন হয়। ১ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য ৪ গ্রাম ক্যালরি শক্তি উৎপাদন করে।

প্রাণীজ প্রোটিনের উপকারিতা ও অপকারিতা দুইই আছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের কোনও অপকারিতা নেই। তবে প্রাকৃতিক খাদ্যনীতি মেনে তা গ্রহণ করতে হবে। ভাত ডাল , তরিতরকারি ও ফলমূল ঈপ্সিত প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে। রুটি, ছাতু হলে আরও ভালো হয়। ডাল জাতীয় খাবার ছাড়া বাদাম জাতীয় ও সূর্যমুখী তেল জাতীয় খাদ্যে প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক উপাদান থেকে বহু প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই অ্যাসিডের হাজার রকম সংমিশ্রণে প্রোটিন উৎপন্ন হয়। আট রকরমের অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরে উৎপন্ন হয় না বলে বিশেষ ধরনের প্রোটিন খাদ্য খেতে হয়। আমাদের অনেকেরই ধারণা প্রোটিন বলতে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদিকে বোঝায়। এগুলি না খেলে সুস্থ থাকা যায় না, বেঁচে থাকা অসম্ভব। ধারণাটি একেবার ভুল। হিন্দু বিধবা মায়েরা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ইস্কন, গৌড়ীয় মঠ, সৎসঙ্গের মতো প্রতিষ্ঠানের অনুগামী, মাড়োয়ারি, সিন্ধি, গুজরাটি সমাজের মানুষ নিরামিষ আহার করেও বাঙালিদের তুলনায় সুস্থ ও সবল। গ্রিকরা শ্রেষ্ঠ খাদ্যকে প্রোটিন বলত। প্রাণীজ প্রোটিনকে আমিষ খাদ্য এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে নিরামিষ খাদ্য বলা হয়। প্রোটিন আমাদের সকলের পক্ষেই অপরিহার্য। এর অভাবে শরীরের বৃদ্ধি হয় না। রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কমে যায়। লিভার ও কিডনির ক্ষতি হয়। হরমোন উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। পরিপাকক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। নানা ব্যাধি আক্রমণ করে।

প্রাণীজ প্রোটিন উত্তম আর উদ্ভিজ্জ প্রেটিন অধম— এ ধারণা ভুল। খাদ্যতত্ত্বের গবেষণায় উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের গুরুত্ব বেশি বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সারা বিশ্বে প্রাণীজ প্রোটিনের কদর কমতে শুরু করেছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন দ্রুত হজম হয় এবং দ্রুত বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে। প্রাণীজ প্রোটিন হজম হতে সময় নেয়, সহজে বর্জ্য পদার্থ নিঃসরণ হয় না। চল্লিশোর্ধদের নানা বিপর্যয়ে ফেলে। প্রাণীজ প্রোটিনকে সামাল দিতে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বিশেষ কার্যকারী ভূমিকা নেয়। আহার হিসেবে মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণীকেই গ্রহণ করে। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিজ্জ খাদ্য চাইই চাই।

প্রচারমাধ্যমগুলি আজ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। বহু বাণিজ্যি সংস্থা যা প্রচার করছে তাই লোকে বিশ্বাস করছে। মাছ, মাংস, ডিম না খেয়ে নিয়মিত ও পরিমিত বাদাম, সয়াবিন, নারকেল, পোস্ত, ডাল খেলে শরীর অটুট ও নীরোগ থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটিন শরীর গ্রহণ করতে পারে না। বাধা পেলে শরীর বিদ্রোহ করে। বায়ু, অম্ল বৃদ্ধি পায় ,ফলে শরীর বিষিয়ে ওঠে। কাজেই প্রোটিন প্রোটিন বলে চিৎকার করা ঠিক নয়।

অত্যধিক প্রাণীজ প্রোটিন খেলে ইনসুলিনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তার ফলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু দুর্বল হতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের কারণ হতে পারে। এক ধরনের চিকিৎসক অজ্ঞানতাবশত বহুমূত্র রোগীদের মিষ্টি ফলমূল বিশেষত মাটির তলার মূল খেতে বারণ করেন এবং প্রাণীজ প্রোটিন খেতে বলেন। এটি খাদ্যতত্ত্বের বিরুদ্ধ মত। অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণের ফলে ধনী ও মধ্যবিত্তরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। অবস্থাপন্ন লোকেরা মুড়ি, চিড়ে, খই, গুড় ছুঁয়েও দেখছেন না। পুষ্টিতত্ত্ববিদদের মতে, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে। পরিশ্রমী মানুষদের জন্য ১/৩ আউন্স প্রোটিন প্রয়োজন। অন্যদের ১ আউন্স যথেষ্ট। প্রাণীজ প্রোটিন ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। তাই সতর্ক থাকা ভালো। নীরোগ ও সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি হলো নিয়মিত ও পরিমিত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ।

(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

বিপন্ন বিরোধীদের সম্বল এখন গুজবের রাজনীতি

অভিমন্যু গুহ

এককথায় গণপিটুনি জিনিসটা অত্যন্ত খারাপ, ভয়ংকরও বটে। এ তো আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা কিছু ইসলামিক দেশে আইন-স্বীকৃত বটে, তবে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে এটি কাম্য নয়। তবে ইদানীং গণপিটুনির আলোচনা বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। ছোট, বড়ো, মেজ, সেজ--- নানা মাপের বিশেষজ্ঞরা রীতিমতো তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলে দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসবার পর 'গোরক্ষক'দের তাণ্ডব বেড়েছে, তাই গণপিটুনির সংখ্যাও বেড়েছে। অথচ ভারতবর্ষে গোরুর চাইতে নিরীহ পশু আর দু'টো হয় না, গত শতকের নয়ের দশকেও কলকাতায় খাটালের রমরমা ছিল। জেলায় জেলায় তা আজও কিছুটা আছে। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পঞ্জাবের মতো রাজ্যে গো-অর্থনীতি সেখানকার একটি বড়ো অর্থনৈতিক ভিত্তি। এঁর যারা পরিচালক তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় অপরাধমূলক (ক্রিমিনাল) অভিযোগ দূরে থাকুক, ব্যবসায়িক অসততার অভিযোগের নজিরও তেমন নেই। কারণটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এঁদের মধ্যে ধর্মভাব প্রবল। যে কোনও ব্যবসায়ীর মধ্যেই তার ইষ্টের সামনে নিজেকে সৎ রাখার প্রয়াস দেখা যায়।

গোরুর তো শুধু দুধ নয়, গোমূত্র, গোবর ইত্যাদিও খুব প্রয়োজনীয় ও দামি। সুতরাং গো-ব্যবসায়ীর রোজগার অন্য সাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে বেশি, তাঁরা অসততার পথে যেতে সচরাচর চান না। গ্রামে গ্রামে ঘুরলে সেখানকার ঘর-গেরস্থালিতেও মা-বোনেদের গো-ভক্তি চোখে পড়বেই। সুতরাং শুধু ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিতে নয়,

জনরোষের জুজু দেখিয়ে দেশের মানুষকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা তো নতুন নয়। আর যেখানে জনরোষের সম্ভাবনাও নেই সেখানে গুজব আর চরিত্র হননই সম্বল।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যেও গো-ভক্তি লুকিয়ে রয়েছে। এই সাধারণ মানুষ 'গণহত্যাকারী', এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। এঁরা গোরুখেকোদের নির্বিচারে পেটাবেন এমন ভাবনাও আসে না। গোরুচোরদের প্রতি জনরোষের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতি অন্য একটি সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করছে। এর মধ্যে জড়িত আছে দেশের অবৈধ বাণিজ্যের একটি অংশ।

গ্রামে গ্রামে গো-ভক্তি যেমন আছে, তেমনি পাচারকারীও আছে। আমাদের দেশের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে দু'টি দেশ, একটির নাম পাকিস্তান, অন্যটির নাম বাংলাদেশ। ইসলামি শাস্ত্রে গোরু ভক্ষণ অবশ্যকর্তব্য নয় বটে, কিন্তু পাকিস্তান-বাংলাদেশের নাগরিকেরা জানে ভারতবর্ষের হিন্দুরা গোরু নামক জীবটিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে সুতরাং গোরু না কাটলে তাদের ধর্মের আর মান থাকে না। আর পরাধীন ভারতে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, এদেশের মুসলমানরা এদেশের খায়, গুণ গায় যদিও আরবের। তাই গো-পাচার আমাদের অর্থনীতির বিশেষ করে বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে এদেশের প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায়। পাশাপাশি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও গো-মাংসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বকরি ইদের দিন চারধারে

তাকালেই বোঝা যায়। এই সব কারবারই এতদিন রমরমিয়ে চলছিল। বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না।

২০১৪ সালে পাশা ওল্টাতেই গেল গেল রব উঠল। এই রবের তীক্ষ্ণতা এমনই যে ২০১৫-র মার্চে মহারাষ্ট্র সরকার অ-বিজেপি হয়েও গো-মাংসের বিক্রি, রপ্তানি, সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা আরও জোরালো করল। কেন্দ্রীয় সরকার এসব ব্যাপারে তখনও অবধি কোনও দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেয়নি। কিন্তু ছোটখাটো যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতেই পাচারকারীদের রক্ত মাথায় উঠেছে।

২০১৭ সালের মে মাসে কেন্দ্র একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়। গো-মাংস রপ্তানির উদ্দেশ্যে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তার আগেই যা যা গুজব, অপপ্রচার নানাবিধ ভাবে চালানো সম্ভব, সবকিছুই হয়েছে।

একটা সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক। ৩০ মে রাজস্থানের একটি ঘটনা বাদ দিলে গো-মাংস বহন করার জন্য গণপ্রহারের বিষয়টি প্রথম দেখা যায় উত্তরপ্রদেশে ২০১৫-র ২ আগস্ট। এরপর ২০১৫-র ২৮ সেপ্টেম্বর দাদরি-তে মহম্মদ আখলাখের হত্যার ঘটনাও একই কারণে, একই রাজ্যে। প্রশ্ন উঠছে আইন-শৃঙ্খলার ভার তো রাজ্যের হাতে? এই গণহত্যার বিরুদ্ধে তৎকালীন অখিলেশ যাদব সরকার কোনও ব্যবস্থা নিতে পারল না কেন? নাকি ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে, এমনকী মুসলমানদের মধ্যেও নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপির জনপ্রিয়তা দেখে ভীত যাদব-সরকার মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ২০১৭-য় বাজিমাত করতে চেয়েছিল? অবশ্য ২০১৭-য় বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দলের ব্যাপক ভরাডুবি বুঝিয়ে দিয়েছে এই স্ট্র্যাটেজি বিশেষ খাটেনি।

যদিও এই স্ট্র্যাটেজিকারদের পরিকল্পনার বিরাম নেই। কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী সরকার দেখলেই এদের ঘুম উড়ে যায়। অটলবিহারী বাজপেয়ী ক্ষমতায় এলেন, কার্গিল হলো, কাশ্মীর উত্তপ্ত হলো। মোদী এলেন, জে এন ইউ থেকে শুরু করে 'গো-রক্ষক' জুজু সরকার-বিরোধী শক্তি ক্রমশ সক্রিয়। ২০১৭-য় গোমাংস রপ্তানি বন্ধ করে মোদী সরকার চার বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। যারা কেবল গো-পাচারই করত না (গো-পাচারকারীদের 'দেশদ্রোহী' আবার বলা বারণ। তারা হল গিয়ে 'মুক্তমনা ব্যবসায়ী'), জালনোট ছাপিয়ে দেশের অর্থনীতিটাকে সর্বস্বান্ত করারও পরিকল্পনা করেছিল। তো মোদী সেই প্ল্যানেরও পৌনে দু'টো বাজিয়ে দিলেন ঐতিহাসিক নোট বাতিল কর্মসূচিতে। এর প্রতিবাদে বিরোধী জোটের এখন বহু মুখ, সবাই প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবিদার, রাহুল গান্ধী যতই মোদী বিরোধিতায় একে তাকে সমর্থন করার কথা বলুন না কেন, ইতিহাসের দিব্যি, কংগ্রেসের সমর্থনে চলা সরকার কখনও চার-পাঁচ মাসের বেশি টেকেনি। এঁদেরই স্বার্থরক্ষায় বলি হতে হচ্ছে কিছু লোককে। কারণ এই লাশের রাজনীতি না করলে, রাজনীতিতে এদের টেকা দায়।

২০১২ সালে রাজস্থানে 'গোরক্ষক' দলের আবির্ভাব হয়েছিল সরকারকে সাহায্য করার কর্মসূচি নিয়েই। আজকে এই নামকে ব্যবহার করে এদের 'খুনে' তকমা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ভারতবর্ষের চোদ্দ শতাংশ মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ককে সুরক্ষিত করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং গোরক্ষকদের নামে সংঘটিত তাণ্ডবের নিন্দা করেছেন, যে কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই প্রধানমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। কিন্তু এই গো-রক্ষার নামে যারা তাণ্ডব করছে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় রহস্যময় কারণে বহুক্ষেত্রেই অপ্রকাশিত। কিছু সংবাদমাধ্যমের চতুরতায় ও প্ররোচনায় বিজেপির ছোটখাট কিছু নেতা ব্যক্তিগত স্তরে অনভিপ্রেত মন্তব্য করেন বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি খুনের মামলাতেও এদের যোগসাজশ প্রমাণিত হয়নি।

সব ঘটনাই যে পরিকল্পিতভাবে কেন্দ্র বা বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হচ্ছে তা ঠাণ্ডা

মাথায় ভাবলেই বোঝা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকালেই আপনি দেখবেন বিজেপি-কর্মীদের উদ্দেশে 'গোমাতার সন্তান' মার্কা কটাক্ষ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার। যেমন কিছুদিন আগে একটি ফেসবুক পোস্ট খুব ভাইরাল হলো যে, সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী নাকি দলিত মহিলাদের বিবাহ ব্রাহ্মণ পুরুষদের সঙ্গে দিতে বলেছিলেন, যাতে তাঁরা জাতে উঠতে পারে ইত্যাদি। এসব কথা নাকি অর্গানাইজারে বেরিয়েছিল। খুব আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে অর্গানাইজার তো ইংরেজি পত্রিকা, শ্রীগুরুজীর ইংরেজি বয়ানটি কোথায়? তাঁর বাংলা তর্জমাই বা করল কে? উত্তর নেই, পুরোটাই অপপ্রচার ও কুৎসা। কারণ জাতপাত বাকিরা মানতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বরাবরই জাতপাতহীন অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করে আসছে। স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত সঙ্ঘের এই বিচারধারার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে 'নির্বাচন' বলে একটি বস্তু রয়েছে। যাঁদের কাছে দেশের গণতন্ত্রের পবিত্র পীঠস্থান একদা 'শুয়োরের খোঁয়াড়' বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাদের মানসপুত্ররা এখনও বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। এঁদের কাছে নির্বাচন হলো লুঠের কারবার। স্বাধীনতার পরও সাংসদ-মন্ত্রীদের আলাদা সামাজিক প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি ছিল। এখন অনেক অসৎলোকও সাংসদ হয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পায়। আর আগে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে অনেকে সাংসদ হতেন। এখন ঠিক উল্টোটা।

চলছে গোরু পাচার।

গোরু-খোর আর পাচারকারীদের উদ্দেশ্য আমরা বোধহয় এখনও ঠিক ধরতে পারছি না যে তাঁরা মোদী সরকারে বিরুদ্ধে যা চান সেটি হলো সাধারণ মানুষের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত তিনটি অক্ষর— 'আতঙ্ক'। এই শব্দত্রয়েই তথাকথিত 'গণপিটুনি'র অনেক 'কার্য-কারণ' লুকিয়ে আছে।

নরেন্দ্র মোদী অধুনাতন এই রাজনৈতিক ধারাটিই পাল্টাতে চেয়েছিলেন। 'না খায়েঙ্গে, না খানে দুঙ্গা' এই নীতিতে কংগ্রেসি-মার্কা অর্থনৈতিক দুর্নীতির মূলোৎপাটন চেয়েছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে রাজনীতিতেও আনতে চেয়েছিলেন দেশভক্তি। যা এখন হয়তো সোনার পাথর-বাটির মতোই শোনায়। এসব রাজনৈতিক ধান্দাবাজির কারবারিদের সহ্য হবে কেন? তাই দেশের জনগণের মধ্যে মোদী জুজু আর মোদী ভীতি তৈরি করতে তারা বদ্ধপরিকর। এরই প্রাথমিক রূপ তথাকথিত 'গোরক্ষক'দের তাণ্ডব। মানুষের এতদিনের বিশ্বাস ও মর্যাদাকে আঘাত করলে প্রত্যাঘাত আসবেই, সুতরাং জনরোষের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই জনরোষের জুজু দেখিয়ে দেশের মানুষকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা তো নতুন নয়। আর যেখানে জনরোষের সম্ভাবনাও নেই সেখানে গুজব আর চরিত্র হননই সম্বল।

আপাতত বিজেপির তথ্য-প্রযুক্তি সেল তৎপর এই গুজব ঠেকাতে। তাদের সতেরো হাজার হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপেই অমিত শাহজীকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু তাতে গুজব আটকানো যাবে কিনা সন্দেহ। হাজার হোক, দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। গত বছর এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে দেখতে বলেছিল যে এই ছ'টি রাজ্যে— রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ঝাড়খন্ড, কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষার নামে গুণ্ডাগিরির বিষয়টি। আসলে গোরু-খোর আর পাচারকারীদের উদ্দেশ্য আমরা বোধহয় এখনও ঠিক ধরতে পারছি না যে তাঁরা মোদী সরকারে বিরুদ্ধে যা চান সেটি হলো সাধারণ মানুষের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত তিনটি অক্ষর— 'আতঙ্ক'। এই শব্দত্রয়েই তথাকথিত 'গণপিটুনি'র অনেক 'কার্য-কারণ' লুকিয়ে আছে। ▮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গণপিটুনি : মমতা দিল্লীতে

চন্দ্রভানু ঘোষাল

নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। স্থান, হাওড়া শহর। চরিত্রের নাম ধরা যাক অতনু। রাত আটটা নাগাদ টিউটোরিয়াল থেকে অতনু বাড়ি ফিরছিল। সকাল থেকেই জ্বর। জ্বরের ঘোরে চোখ প্রায় বুজে আসছে। এই অবস্থায় কদমতলা বাজারের ভিড় কাটিয়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে এক পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। তিনি তো রেগে একেবারে খাপ্পা। কথা বলতে গিয়ে অতনুর জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি ধরে নিলেন সে নিশ্চয়ই নেশাভাং করেছে। ওই পথচারীর চিৎকারে কিছুক্ষণের মধ্যে লোক জড়ো হয়ে গেল। এবং সকলেই একবাক্যে মেনে নিল, হ্যাঁ, অতনু নির্ঘাত নেশা করে সাইকেল চালাচ্ছে। শুরু হলো মার। প্রথমে চড়থাপ্পড়। তারপর লাঠি লোহার রড...। পরের দিন হাসপাতালে মারা গেল অতনু।

প্রায় তেইশ বছর আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা আজও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ রাজ্যের নেতারা প্রায়ই সাধারণ মানুষকে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সব দিক থেকেই ভারতের অন্য রাজ্যগুলি থেকে আলাদা। ভারতের অন্য রাজ্যে যেসব ঘটনা ঘটে তা এখানে ঘটা সম্ভব নয়। অথচ এন সি আর বি-র (ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো) তথ্য ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে গণপ্রহারের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান একেবারে শীর্ষে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই তথ্য জানেন না, তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শুধু বিজেপি- শাসিত রাজ্যগুলির দিকে আঙুল তোলেন। সমালোচনা করেন সঙ্ঘের। যেন দেশে ক্রমবর্ধমান গণপ্রহারের জন্য দায়ী শুধু সঙ্ঘ এবং বিজেপি। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মেরুকরণের রাজনীতি এবং তার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়াটা কোনও কারণই নয়। একথা অনস্বীকার্য, গণপ্রহারের মতো একটি অমানবিক ব্যাপার কোনও অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এক শ্রেণীর মানুষের আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নও জরুরি। কিন্তু তার আগে জানা দরকার এই বিপজ্জনক প্রবণতার মাপকাঠিতে আমাদের গর্বের পশ্চিমবঙ্গ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি অভিযোগ করেছিলেন, গত ছ'মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১৯ জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন। ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনের জন্য যে মহাজোটের পরিকল্পনা করা হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার অন্যতম প্রস্তাবক। সেই কারণেই এ রাজ্যের বিজেপি কর্মীদের ওপর দলবদ্ধ হিংসা চলছে। স্মৃতির প্রশ্ন, এই হিংসা কি গণহিংসা নয়? বলাবাহুল্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি।

জলপাইগুড়িতে চারজন মহিলাকে নির্দয়ভাবে মারার ব্যাপারেও মমতা বা তার প্রশাসন এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। মমতা বর্মণ (৪৮), সারথু সাহানি (৫০), পায়েল দাস (২০) এবং গীতা দাস (৪৫) নামের ওই চার মহিলার বক্তব্য, তারা সেদিন গ্রামে (ধূপগুড়ি অঞ্চলে) গিয়েছিলেন মাইক্রো-ফিনান্স অফিস থেকে টাকা তোলার জন্য। কিন্তু গ্রামের লোক তাদের চোর সন্দেহে একটা ক্লাবের মধ্যে আটকে রেখে বেধড়ক মারধোর করে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না নিলে ওই মহিলারা বিপদে পড়তেন।

ছেলেধরা সন্দেহে গণপ্রহারের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ বাড়ছে। কিছুদিন আগে মালদার বুলবুলচণ্ডী-ডুবাপাড়া গ্রামে ছেলেধরা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও শেষরক্ষা হয়নি। হাবিবপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে মারার আর একটি ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ির বারোঘরিয়া গ্রামে। সেখানে মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলাকে পিটিয়ে মারা হয়। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে উঠলেও পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের মধ্যে তৃণমূলের নেতারাও আছেন।

সারা দেশে গণপ্রহারের যতো ঘটনা ঘটে তার সিংহভাগ ক্ষেত্রেই জড়িয়ে থাকে গোরু চুরি ও পাচারের বিষয়টি। পশ্চিমবঙ্গেও ৫৫ শতাংশ গণপ্রহারের ঘটনা ঘটে এই কারণে। গ্রামের বেশিরভাগ নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়িতে গোয়ালঘর নেই। বাড়ির উঠোনে বা পিছন দিকের খালি জমিতে গোরু-মোষ বেঁধে রাখার চল। তারই সুযোগ নেয় দুষ্কৃতীরা। বলা বাহুল্য, এরা সকলেই মুসলমান। গৃহস্থের গোরু চুরি করে এরা পৌঁছে

মালদার হাবিবপুরে গতবছর ডাইনি সন্দেহে মহিলাকে মারধর।

কলকাতার বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় (১৯৮২)। চলছে শেষকৃত্যের কাজ।

সরব, পশ্চিমবঙ্গে নীরব

দেয় সীমান্তের ওপারে। তারপর কেটে তার মাংস অনেক হাত ঘুরে পৌঁছে যায় সৌদি আরবে। নোটবাতিলের ফলে ধস নামার আগে গোরু চুরি এবং পাচার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলে থাকেন, এই ব্যবসা মন্দার মুখে পড়ায় তৃণমূল নেতারা যে কাটমানি (প্রত্যেক মাসে ১০০ কোটি টাকা) পেতেন তা বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে গোরু চুরি বন্ধ করতে মানুষও এখন মরিয়া। রুটিরুজিতে টান পড়ার ফলে মুসলমান গৃহস্থও এ ব্যাপারে কিছু কম যান না। কয়েক মাস আগে কোচবিহারের ধুপগুড়িতে নজরুল ইসলাম, আনওয়ার হোসেন এবং হাফিজুল শেখ নামের তিন যুবক গণপ্রহারে মারা যায়। অভিযোগ, তারা গোরু পাচার করছিল। বারোহালিয়া গ্রামের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাদের আটকায়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এখনও পর্যন্ত যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের মধ্যে মুসলমানেরাও আছে।

গণপ্রহারের প্রতিটি ঘটনার পিছনে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় বাংলা মিডিয়া যতই বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্ররোচনা খুঁজুক, ব্যাপারটা আদপেই সত্যি নয়। হিন্দু-মুসলমানের বিবাহে হিন্দু যুবকদের পিটিয়ে মেরে ফেলা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ঘটনা। ফেসবুক খুললেই দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে। হিন্দু যুবকটি ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে হবু স্ত্রীর (মুসলমান) জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক সেই সময় তার ওপর চড়াও হয় একদল সশস্ত্র মুসলমান। শুরু হয় বেদম মার। ঘটনাস্থলেই মারা যান ওই যুবক। কোনও কাগজেই খবরটা বেরোয়নি। প্রশাসনও নির্বিকার। কেউ জানে না এরপর কী এবং এরপর কে!

তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই প্রবণতা হঠাৎ তৈরি হয়নি। এ রাজ্যে গণহিংসার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আজ বামপন্থী দলগুলি যতই প্রতিবাদ করুক, গণহিংসার প্রবক্তা তারাই। রাজনৈতিক কারণে হত্যা করার রীতি তারাই এনেছে পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৮২ সালের ঘটনা। সেবার ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে বিজন সেতুর ওপর প্রথমে পিটিয়ে তারপর পুড়িয়ে হত্যা করে সিপিএমের গুণ্ডারা। জোতি বসু বলেছিলেন, 'এরকম তো হতেই পারে।' সিপিএমের নেতারা মনে করতেন আনন্দমার্গের সন্ন্যাসীরা শিশুপাচারের সঙ্গে যুক্ত। তাই তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলো। কাউকে ছেলেধরা বলে সন্দেহ হলেই যে মেরে ফেলা যায় সেই তত্ত্ব বৈধতা পেল ওই ঘটনার পর। এন সি আর বি-র তথ্য ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে মারার প্রবণতা ওই ঘটনার পর থেকেই বেড়েছে।

এরপর ১৯৯০। সেবার যে ঘটনা ঘটল তার মতো কলঙ্কজনক কোনও কিছুর কল্পনা করাও দুষ্কর। চারজন মহিলাকে বানতলার কাছে ধর্ষণ করে খুন করল সিপিএমের হার্মাদেরা। চারজনের মধ্যে অনিতা দেওয়ান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন মিডিয়া অফিসার, উমা ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং রেণু ঘোষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের প্রতিনিধি। অনিতা দেওয়ানের শরীর দুষ্কৃতীরা এমনভাবে বিকৃত করেছিল যা অনেক পরে নির্ভয়া কাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কী কারণে এই বর্বরতা? এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে একবার আলোকপাত করেছিলেন। তিনি বলেন, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কয়েকটি সিপিএম-পরিচালিত পঞ্চায়েত ইউনিসেফের দেওয়া বিপুল পরিমাণ টাকার কোনও হিসেবই দিতে পারছিল না। অনিতা দেওয়ানরা সেদিন অর্থ তছরূপ সংক্রান্ত কিছু গোপন কাগজপত্র উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরছিলেন। বানতলায় তারা আক্রান্ত হন। গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ড্রাইভার ওইখানেই খুন হন। তারপর সিপিএমের ১০-১২ জন কর্মী অনিতা দেওয়ানকে ধর্ষণ করার পর খুন করে।' বলা হয়, যেসব কাগজপত্র অনিতাদেবীরা উদ্ধার করেছিলেন তা যদি দিনের আলো দেখার সুযোগ পেত তাহলে জ্যোতি বসুর মতো নেতাও সহজে রেহাই পেতেন না।

এরপর কী আর বাঁচতে দেওয়া যায়! জ্যোতি বসুরা যা শুরু করেছিলেন মমতা সেটাই অনুসরণ করে চলেছেন। একদিকে একটার পর একটা সরকার গদিতে থাকার রেকর্ড গড়ছে। অন্যদিকে কিছু মানুষের মধ্যে বাড়ছে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা। দেখেশুনে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। নয়তো এই অন্ধকার কিছুতেই কাটবে না।

মরিচঝাঁপিতে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড (১৯৭৯) পড়ে আছে মৃতদেহের সারি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাঁদপাড়ায় জনরোষের বলি দীপঙ্কর রায় (২০১৬)।

কলকাতার গার্ডেনরিচে নির্মমভাবে খুন করা হয় ডিসি পোর্ট বিনোদ মেহতাকে (১৯৮৪)।

এই সময়

ব্রিকস্

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ব্রিকস্ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বহুত্ববাদ, আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য এবং একটি সুশৃঙ্খল বিশ্ব নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রযুক্তির দুনিয়ায় যে বিপ্লব ঘটে চলেছে, প্রধানমন্ত্রী তাতে সবাইকে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

মেয়াদ

আয়কর রিটার্ন জমা দেবার মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্স

(সিবিডিটি)-এর পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, রিটার্ন জমা দেবার শেষ দিন ৩১ আগস্ট ২০১৮। সারা দেশের বিভিন্ন মহলের অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত।

অপমানিত গ্যাংস্টার

গ্যাংস্টার আবু সালেম সঞ্জু ছবির নির্মাতাদের নামে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে। কারণ ছবিতে

তার সম্বন্ধে অনেক ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। আবু সালেমের দাবি, তার জন্য নির্মাতাদের ক্ষমা চাইতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষমা না চাইলে সে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবে।

সমাবেশ -সমাচার

সোদপুর কামধেনু অনুসন্ধান কেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ ও ফলের চারা বিতরণ

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কামধেনু অনুসন্ধান কেন্দ্র এবং কর্ণমাধবপুরের 'কর্মযোগী' সমাজসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৬ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের কামধেনু অনুসন্ধান কেন্দ্রে নানান ফলের প্রজাতির চারা দিয়ে একটি বাগিচা তৈরি করা হয় এবং বিভিন্ন ফলের চারা বিতরণ করা হয়। উদ্দেশ্য আগামীদিনে এখান থেকে তৈরি হবে চারাগাছ এবং তা স্থানীয় মানুষের কাছে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। কামধেনু অনুসন্ধান চত্বরে মাসখানেক আগেও রচিত হয়েছে অধিক ঘনভাবে স্থাপিত ফলের বাগান। এভাবে ফলচাষ করে লাভ বেশি পাবেন উদ্যানপালকেরা। এটা প্রদর্শিত হচ্ছে বাগিচা ফসল ও সবুজ গোখাদ্যের মিশ্রচাষকে কৃষিজীবী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। গোপালনের সঙ্গে উদ্যান-পালন যে যুগপৎ সম্ভব তা দেখিয়ে দিতেই এই প্রদর্শন।

এতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করেছেন উদ্যানবিদ অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী। তারই সূত্রধরে এদিন দ্বিতীয় বাগানটি রচিত হয়। কারণ গুণমানে উন্নত চারা কৃষকদের কাছে পৌঁছলে তবেই তার সুফল পাওয়া যাবে। তার জন্য চারার জোগান চাই। আর সে কাজ কেবল একলা সরকারের নয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়। স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাই সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান 'কামধেনু অনুসন্ধান কেন্দ্র' এবং 'কর্মযোগী' তাতে শামিল হয়। প্রযুক্তি ও উন্নত চারার জোগান দিয়েছে কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এদিন ফল গবেষণা প্রকল্প-আধিকারিক অধ্যাপক দিলীপ মিশ্রের সহযোগিতায় নানান ফলের চারা রোপিত হয়। নানান জাতের আম, কলা পেয়ারা, বেল, জামরুল, জলপাই, লিচু, গোলাপ জাম ও প্যাশান ফ্রুটের চারা লাগানো হয়।

অন্যদিকে, একই দিনে খড়দহের বন্দিপুর অঞ্চলে অধিক ফলনশীল ফলের চারাগাছ বিতরণ করা হয়। সেখানে চারা বিতরণের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের চারার যত্নআত্তি সম্পর্কে অবহিত করেন অধ্যাপক দিলীপ কুমার মিশ্র ও অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী। এদিন এখানে পরিবেশ সচেতনতামূলক শিবির চলে। শিবিরে গাছের চারা রোপণ করেন সর্ব ভারতীয় সমন্বিত ফল গবেষণা প্রকল্পের আধিকারিক অধ্যাপক দিলীপ কুমার মিশ্র, অধ্যাপক কল্যাণ চক্রবর্তী, 'কর্মযোগী'-র সম্পাদক অসীম অসীম মণ্ডল। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সনৎ বসুমল্লিক, গবেষক দেবাশিস রানা, সমাজসেবী উজ্জ্বল দাস, বাপী কুণ্ডু, সুজিত চক্রবর্তী প্রমুখ।

এই সময়

যাত্রা শুভ হোক

রেল দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার ভারতীয় রেল এবার থেকে ইঞ্জিনে তিনটি বিশেষ যন্ত্র

বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রেলওয়ে ট্র্যাকের পরিস্থিতি বোঝার জন্য ডাইনামিক ট্র্যাক ট্যানপিং মেশিন, ভার কমানো ও স্ক্যান করার বিশেষ যন্ত্র এবং ক্রসিং ট্যামপিং মেশিন।

ইয়ে তো 'কামাল' হো গয়া

দক্ষিণী সুপারস্টার কামাল হাসান রাজনৈতিক দল তৈরি করেছেন। নাম মাক্কাল নিধি

মইয়াম। সম্প্রতি ন্যাসকমের একটি সম্মেলনে তিনি বলেন, তার দল 'স্মার্ট ভিলেজ' তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। উল্লেখ্য, স্মার্ট ভিলেজ মোদী সরকারের প্রকল্প।

অন্ধজনের আলোয়

সংগঠনের নাম অন্ধ কন্যা প্রকাশ গ্রু। ২০০ জন দৃষ্টিহীন মহিলা এর সদস্য। রাখিবন্ধনের

আর বিশেষ দেরি নেই। তাই এই মহিলারা দিনরাত এক করে রাখি বানিয়ে চলেছেন। প্রতিবন্ধী হলেও তারা পরনির্ভর নন। রাখি বানানো তাদের পেশা। আত্মমর্যাদাহীন জীবন ওরা চান না।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৪ জুলাই বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা কলকাতার ২৬নং বিধান সরণীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, অখিল ভারতীয় সেবা ভারতীর সেল্ফ হেল্প গ্রুপের সুন্দর লক্ষ্মণ, সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের প্রচারক প্রদীপ জোশী, দক্ষিণবঙ্গ

প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জি, স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত প্রমুখ। সভায় বিগত ২০১৭-১৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। বিশিষ্ট লেখক সুব্রত ব্যানার্জির পরিচালনায় আগামী ২০১৮-১৯ সালের কর্মসমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে নতুন কর্মসমিতি গঠন করা হয়। সভাপতি : অজয় নন্দী, সহ-সভাপতি : তপন কুমার নাগ এবং জীবনময় বসু, সম্পাদক : তপন গাঙ্গুলী, সহ-সম্পাদক : বিশ্বনাথ নন্দী, সদস্য : অদ্বৈত চরণ দত্ত, বিদ্যুৎ মুখার্জি, ড. বিজয় আঢ্য, তরুণ কুমার পণ্ডিত, শক্তিশেখর দাস, প্রণয় রায় এবং ডাঃ পার্থপ্রতিম মুন্সী। সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী। উল্লেখ্য, সারা বছরে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি বিভিন্ন স্থানে মেডিক্যাল ক্যাম্প করে। চক্ষু পরীক্ষা হয়েছে ৯০৮ জনের। তার মধ্যে ৫৯১ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। এছাড়া ইসিজি, শল্যচিকিৎসা, জেনারেল পরীক্ষা করা হয় ৫৮০ জনের। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থাকে ১ লক্ষ টাকা দান হিসাবে দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক ক্রয় এবং স্কুল কলেজের ফ্রি বাবদ ৩৫৭৭৫ টাকা দেওয়া হয়েছে। রিলিফ ও চিকিৎসার জন্য ৬৮৯১০ টাকা দেওয়া হয়।

বালুরঘাটে এবিভিপি-র কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ২১ জুলাই বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। স্থানীয় নাট্য মন্দিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বালুরঘাটের বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা এবং শুভেচ্ছা জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বই, পদক, শংসাপত্র, কলম দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উনুষ্ঠানে প্রধান

এই সময়

খতম কুপওয়ারায়

নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে আরও একজন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হলো। জম্মু ও কাশ্মীরের

কুপওয়ারা জেলায় ঘটেছে এই ঘটনা। চেক সোদুল গ্রামে সেনাবাহিনী, সি আর পি এফ এবং রাজ্য পুলিশের জওয়ানদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সংঘর্ষে মারা যায় ওই জঙ্গি।

গাড্ডায় মাল্য

বিজয় মাল্য গভীরতর গাড্ডায় পড়েছেন। ইউ কে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তার আপলি

নাকচ করে দিয়েছে আদালত। এর ফলে বিজয় মাল্যর বিদেশি সম্পত্তি বিক্রি করে ৯০০০ কোটি টাকা উদ্ধার করতে সমর্থ হবে ভারতের ১৩টি ব্যাঙ্ক।

তদন্তে সিবিআই

কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা তথ্য প্রতারণার মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন

কেন্দ্রীয় আইন এবং আইটি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। রাজ্যসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রী জানান, সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে।

সমাবেশ -সমাচার

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের ৩০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মালদা বিভাগ সংযোজক অভিনন্দন দাস, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রমুখ প্রবীর কুমার মণ্ডল, জেলা সহ প্রমুখ টুটুন মণ্ডল, জেলা সংযোজক

অতনু দাস, জেলা এস.এফ.ডি প্রমুখ জ্যোতিষ বর্মন-সহ জেলা ও নগর স্তরের বিভিন্ন কার্যকর্তা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদে শিল্পীদের পরিবেশিত নৃত্য সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন শিক্ষক শংকর জোয়ারদার ও শিক্ষিকা পায়েল সরকার।

গণেশ চন্দ্র দত্ত-র স্মরণ সভা

গত ২২ জুলাই কাটোয়া রবীন্দ্র পরিষদে প্রয়াত গণেশ চন্দ্র দত্তর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাটোয়া (বর্ধমান) জেলার কার্যকর্তা পূর্ণেন্দু দত্তের পিতৃদেব। গত রামনবমী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে জনসভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছিল, এই কার্যক্রমেরই কাটোয়ার অন্যতম কার্যকর্তা ছিলেন পূর্ণেন্দু। এই আন্দোলনে সক্রিয় যোগদানই পরোক্ষভাবে তাঁর পিতৃদেবকে হারানোর

কারণ বলেই স্থানীয় মানুষরা মনে করেন। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিভাগ প্রচারক প্রভাত মণ্ডল, বিভাগ কার্যবাহ প্রদীপ চৌধুরী, বিভাগ ঘোষপ্রমুখ রঞ্জিত ঘোষ, কাটোয়া জেলা কার্যবাহ মলয় মণ্ডল, জেলা সঙ্ঘচালক ড. দয়াময় বিশুই-সহ বহু নাগরিক।

গৌরী মা ও গোপালের মা অনন্ত শক্তির প্রতিভূ

শ্রাবণী সিংহ

''এইমাত্র জানা ছিল যে 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' একটি জ্যোতির্ময় বেষ্টনী, তার ভিতর প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর রামকৃষ্ণের ভাব ও শক্তির প্রতিবিম্ব।''

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় উক্তিটি করেছেন তাঁর 'মাতৃদ্বয়' পুস্তিকায়। মহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থসম্ভার পাঠ করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতে হয়। বিশেষত 'মাতৃদ্বয়' পুস্তিকার দুই মা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ ভক্ত পরিমণ্ডলের গৌরী মা এবং গোপালের মা-র অনন্ত ভালোবাসা হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

গৌরী মা

গোপালের মা

তৎকালীন সময়ে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। শিক্ষার আলো তখনও সেভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছয়নি। তাই মহিলা ভক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁদের জীবনকথা বিশেষভাবে জানা না গেলেও— ''এইমাত্র জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল যে গৌরী-মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিতা, তজ্জন্য সকলের পূজনীয়া ও শ্রদ্ধেয়া।''

গৌরী মা ছিলেন ভালোবাসার প্রতিমূর্তি। মহেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল। তাই কোনও পালাপার্বণে পার্বণী স্বরূপ একটা টাকা, আধুলি বা সিকি যেমন তাঁকে দিতেন, তেমনি তাঁর 'বিখ্যাত খিচুড়ি' রান্না করলে মহেন্দ্রনাথকে লোক মারফত ডেকে খাওয়াতেন। আবার মহেন্দ্রনাথকে তাঁর প্রিয় মালপো খাওয়াতে কখনও ভুলে যেতেন না মাতৃপ্রতিমা গৌরী মা।

কঠিন কোমলে গড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গৌরী মা নারীজাতির উন্নতিকল্পে সঙ্ঘজননী সারদামায়ের আশীর্বাদে গড়ে তুললেন 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম।' যার কর্মপ্রবাহ আজও বর্তমান। পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথ দত্তের আন্তরিক উপলব্ধি— ''গৌরী মাকে আমি আদ্যাশক্তির অংশ বলিয়া ধারণা করি। এইজন্য তাঁহার চরণে আমি শতকোটি প্রণাম করি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।''

কামারহাটির বাসিন্দা গোপালের মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী বিধবা ব্রাহ্মণ রমণী। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা ও জপ করতেন। ''শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপাল ভাবে ইহাকে দর্শন দিয়া 'মা' বলিয়াছিলেন।'' রামকৃষ্ণ ভাব সাধনার সকল সন্তানের জন্য তাঁর অন্তর কাঁদত। মহেন্দ্রনাথের সহজ সরল স্বীকারোক্তি— ''কলাপাতা মোড়া দুটি আতা সন্দেশ বাহির করিয়া অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আবেগে আমার মুখে একটু করে খাওয়াতে লাগিলেন ও বাঁ হাতটি দিয়া মাথায় কাঁধে ও পিঠে বুলাইতে লাগিলেন।'' আবার তাঁর গৃহে উপস্থিত হলে তিনি আনন্দের সঙ্গে পান খাওয়াতেন।

তথাকথিত শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্তা না হলেও তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ বিদুষী রমণী। ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর বাড়িতে ভক্তবৃন্দের নানা কঠিন প্রশ্নের তিনি ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত, নিবিষ্ট চিত্তে সহজ উত্তর দিতেন। আবার জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান করতেন। আর বলতেন ''ওগো গোপাল এই বলছে,'' নিরাকার গোপালের সঙ্গেই তাঁর প্রতি নিয়ত যত খেলা, স্নেহ, প্রীতি, আদর, ভৎর্সনা, শান্তি, সুখ, মান অভিমানের পালা। এ যেন বাৎসল্যরসের পরাকাষ্ঠা। এ আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধির বাইরে এক অসীম লোকের চিন্তা চেতনার স্তর পরম্পরার আধ্যাত্মিক জগৎ। দার্শনিক মহেন্দ্রনাথের অনুভব ''ইহা প্রত্যক্ষ জীবন্ত বস্তু। প্রত্যক্ষ না দেখিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা দুরূহ ব্যাপার।''

ভক্তিপ্রাণা গোপালের মা ছিলেন মুক্তমনা। তাই ভগিনী নিবেদিতার মতো একজন বিদেশিনীকে অতি সহজে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। বাগবাজার পল্লীর রাস্তায় পরিচিত মানুষজনকে বলতেন, ''ওগো এটি আমার গোপালের, এটি নরেনের মেয়ে।''

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে গোপালের মা অসুস্থ

হয়ে পড়েন। শেষ সময়ে ভগিনী নিবেদিতাই ছিলেন তাঁর আশ্রয়। এ এক আশ্চর্য গভীর সম্পর্কের রসায়ন। যাঁর আবেদন সর্বজনীন, চিরকালীন। ''ভগ্নি নিবেদিতা গোপালের মাকে সেবা করার জন্য নিজ ভবনে লইয়া যান, ''চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পন্না, অফুরন্ত প্রেমের অধিকারিনী, ঈশ্বরনিষ্ঠ, স্থৈর্য, ধৈর্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা প্রগাঢ় সহানুভূতিশীল, ভালোবাসার বিগ্রহ স্বরূপিণী গোপালের মা ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই ব্রাহ্মমুহূর্তে গঙ্গাগর্ভে শরীর ত্যাগ করেন।

পূজ্যপাদ মহেন্দ্রনাথের অনুপম লেখনীতে ''বৃদ্ধা গোপালের মা আমায় অতিশয় স্নেহ করিতেন, এইজন্য এস্থলে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাইতেছি।''

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালোবাসা, সমদৃষ্টিপাত, সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে মুক্তাঙ্গনে পদাচারণা, সীমিত ক্ষমতাকে আশ্রয় করে অসীমের বন্দনা, আধ্যাত্মিকতার ক্রম উত্তরণ, নিজের মধ্যে অন্তর শক্তির উদ্বোধন, চিন্তা-চেতনার বিকাশ, দুঃখের মধ্যে আনন্দ যাপন। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসা মাতৃত্বের যুগলমূর্তি গৌরী মা ও গোপালের মা'র সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের ভাবনা নারীশক্তিরই ক্রমজাগরণের দিকে আমাদের সৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তাঁর অনুনকরনীয় লেখনী ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে শক্তিরূপিণী এই দুই মহীয়সীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ■

ইতিহাসের কথায় পুরীর জগন্নাথ মন্দির

বিমলকৃষ্ণ দাস

''নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় 'তে নম'ঃ।।''

স্মরণাতীত কাল থেকে অগণিত ভক্তের দল প্রভু জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রার প্রতি এমনি করেই প্রণতি জানিয়ে আসছে। কিন্তু এই নীলাচল পতি নীলমাধবের সন্ধান লাভ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে অত সহজ হয়নি। কাহিনি সেরকমই রয়েছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তার আরাধ্য দেবতা ভগবান বিষ্ণুর নীলমাধব রূপে অবস্থানের কথা জানতে পেরে প্রধান পুরোহিত বিদ্যাবতীকে পাঠালেন তাঁর সন্ধান করতে। বিদ্যাবতী ঘুরতে ঘুরতে শবর প্রধান বিশ্বাবসুর গৃহে অতিথি হলেন। কালান্তরে তার কন্যা ললিতার সঙ্গে বিবাহ হলো তার। এক সময় বিদ্যাবতী সন্ধান পেলেন বিশ্বাবসু নীলাচল পর্বতের কোনও গুহায় গোপনে নিত্য নীলমাধবের পূজার্চনা করেন। খবর শুনে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তার গুহায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন দেবমূর্তি অন্তর্হিত। দেবদর্শনে আমৃত্যু অনশন ব্রত গ্রহণ করলেন তিনি। একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন দারুমূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য।...এমন ভাবেই তৈরি হয়েছে ভক্ত আর ভগবানের কালজয়ী ইতিহাস। শ্রীশ্রী জগন্নাথের লীলাক্ষেত্র এই ধামকে বলা হয় জগন্নাথপুরী, সংক্ষেপে পুরী। কিন্তু পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, শঙ্খক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, নীলাচল ইত্যাদি নামেও প্রসিদ্ধ এই তীর্থধাম। ওড়িশার রাজকাহিনির প্রামাণিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় 'মাদলা পাঁজি' থেকে (তালপাতার পুঁথি)। তাছাড়া মৈহর শিলা লেখ, নাগপুর শিলালেখ ও পূজারি পালী শিলালেখ থেকেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গাধিপতিরূপে পাওয়া যায় মারবেন-এর নাম। নিজে জৈন্য ধর্মাবলম্বী হয়েও বহু হিন্দুমন্দির তিনি নির্মাণ করেন, মারবেনের পরে তিন'শ বছরের ইতিহাস প্রায় অবলুপ্ত, চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ ওড়িশায় মারাঠা বংশের উত্থানের কথা পাওয়া যায়। যথাসম্ভব কলিঙ্গ অধিকারের পরে তারাই প্রথম শ্রীজগন্নাথকে বাসুদেব নারায়ণ রূপে পূজা করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শৈলোদ্ভব বংশের রাজা মাধবরাজ গুপ্ত দ্বিতীয় (৬২০-৬৫০ খ্রি:) সমুদ্র পাড়ে মন্দির নির্মাণ করে নীলমাধবের পূজার্চনা করতেন বলে কথিত। শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের পূজার্চনার উল্লেখ পাই চান্দল্যরাজ কীর্তিবর্মণের রাজত্বকালে (১০৪১-১০৭০)। পুরীধাম চিরদিনই সর্বমত-সমন্বয় ক্ষেত্র। ভৌমকর রাজারা ছিলেন এর বড় প্রমাণ (৭৩৬ খ্রি:)। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের প্রতি ছিলেন সমান অনুরাগী। এই সময় তন্ত্রসাধনারও প্রসার ঘটে এখানে। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৯২৩ খ্রি:) ভৌমকর বংশের পতন হলে দক্ষিণ কোশলের শক্তিশালী সোমবংশীয় রাজা যযাতিকেশরী ওড়িশা অধিকার করেন। যযাতিকেশরীই পুরীতে মাঝারি একটি জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন বলে কথিত। সোমবংশীয় রাজাদের সময়েই নির্মিত হয় ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দির, নির্মিত হয় জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন নৃসিংহ মন্দির (৬০ ফুট)।

পুরীর উপরে প্রথম বহিঃশত্রু মুসলমান আক্রমণ হয় যযাতি কেশরীর ১৪৬ বছর আগে। জলপথে এসে সমগ্র পুরী ধ্বংস করে রক্তবাহু, নৃশংস হত্যা আর রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়। সে সময় জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রার মূর্তি গোপানী নামক গ্রামে কোনও এক কুটিরে লুকিয়ে রেখে পূজা করা হয়। এরপরে ক্রমান্বয়ে আক্রমণ। উপায়ন্তর না দেখে পূজারীরা মূর্তি 'পাতালি' করে অর্থাৎ মাটি চাপা দিয়ে রাখে, চিহ্ন হিসেবে উপরে পুঁতে দেয় এক বটের চারা। এই সঙ্কটকালে ১৪০ বছর প্রায় জগন্নাথদেবের পূজার্চনা বন্ধ ছিল। যযাতিকেশরী প্রথমই এই মূর্তির সন্ধান করে দেববিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূজার্চনা শুরু করেন।

মাদলা পাঁজিতে বর্ণিত হয়েছে নেপালরাজ শঙ্করাচার্য এবং পুরীরাজের হাতে তিনটি অমূল্য শালগ্রাম

শিলা তুলে দেন। এই শিলা তিনটি প্রভু জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রার দারুমূর্তির বক্ষদেশে স্থাপন করা হয়। একে বলা হয় 'ব্রহ্ম'। নেপাল রাজ তাই পুরীতে এলে পুরীরাজের সমান সম্মান পান এই 'ব্রহ্ম' দানের জন্য।

চোড়গঙ্গদেব বা রাজা অনন্তবর্মণের রাজত্বকাল (১১৯২ খ্রি:) ওড়িশার ইতিহাসে স্মরণীয়। 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি নিয়ে তিনি যেমন এক উচ্চমার্গের সাধন ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন পুরীকে, তেমনি তাঁর শৌর্য বীর্যের প্রতাপে পরবর্তী তিনশ বছর বহু আক্রমণ সত্ত্বেও ওড়িশাকে কখনও মুসলমান শাসনের অধিকারে আনা সম্ভব হয়নি। এই মহাপ্রতাপী ভক্তপ্রবর রাজ্য অনন্তবর্মণই পুরীর মূল জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ শুরু করেন, এই মন্দির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় তার সপ্তম পুরুষ রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে (১২১১-১২৪২ খ্রি:)।

'মাদলাপাঁজি' ও 'সিরাজ ই ফিরোজ শাহীর' বর্ণনা অনুযায়ী ভানদেব তৃতীয়ের (১৩৫৮-১৩৭৮) কয়েকজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মুসলমান আগ্রাসনকারীরা ওড়িশায় প্রবেশের সুযোগ পায়। চলতে থাকে মন্দিরের উপর অত্যাচার, ধ্বংসলীলা। মারাঠা শক্তি ওড়িশার দখল না নেওয়া পর্যন্ত এর কোনও পরিবর্তন হয়নি।

গজপতিরাজা প্রতাপরুদ্রের সময়কে (১৪৯৭ খ্রি:) বলা যায় ওড়িশা তথা পুরীর এক স্বর্ণযুগ। ওড়িশার রাজ্যভার গ্রহণ করার পরে তার ভক্তির গভীরতা ও কর্মকুশলতায় পুরী তীর্থযাত্রীদের কাছে হয়ে ওঠে অধিকতর আকর্ষণীয়, পরমপ্রাপ্তির এক ধামরূপে। এই সময়ই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলা কাল। তাঁর উপস্থিতিতে পুরী ভক্তির বন্যায় প্লাবিত হয়ে উঠে। গৌড়ের রাজা হুশেন শাহ প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালেই পুরী আক্রমণ করেন (১৫০৯ খ্রি:), যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হয়। প্রতাপরুদ্র ওই সময় দক্ষিণ দেশে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সুযোগে এই আক্রমণ। প্রতাপরুদ্র ফিরে অসায় সমাচার পেতেই ফিরে যান হুশেন শাহ। কিছু ঐতিহাসিকের মতে অবশ্য এই আক্রমণকারী ছিল হুসেন শাহর সেনাপতি ইসমাইল গাজি। ধ্বংসলীলার প্রতীক কালাপাহাড় যখন পুরী আক্রমণ করে তখন ওড়িশায় চালুক্যবংশের মুকুন্দদেব হরিচন্দন রাজত্ব করেছিলেন। মুকুন্দদেব যখন অন্য সেনাপতি সিকন্দর উজবেগের সঙ্গে অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সুযোগে কালাপাহাড় পুরী ও মন্দির আক্রমণ করে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। নির্মম ভাবে চলে তার হত্যালীলা। লুকোন জায়গা থেকে জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্তিকে হাতীর পিঠে বেঁধে নিয়ে গঙ্গার পাড়ে অর্ধদগ্ধ করে জলে ফেলে দেয়। বিসরা মহান্তি নামে এক ভক্ত সাহসে ভর করে ওই অর্ধদগ্ধ বিগ্রহ থেকে 'ব্রহ্ম' উদ্ধার করে কুজঙ্গগড় নামক স্থানে লুকিয়ে রাখে। ওড়িশা আফগান অধিকারে গেলে তাদের অত্যাচারে ১৫৬৮ থেকে ১৫৯২ খ্রি: পর্যন্ত মন্দিরে কোনও বিগ্রহ ছিল না। সম্রাট আকবরের দখলে ওড়িশা এলে তাঁর সেনাপতি মানসিংহ পুনঃ মন্দিরে পূজার্চনার সুবন্দোবস্ত করেন। ঔরঙ্গজেবের সময় আবার আক্রমণের ঢল। কালাপাহাড়ের পরে লম্বা আক্রমণকারীদের তালিকা যারা নিরন্তর পুরীর মন্দিরের আঘাতের পর আঘাত হেনেছে নির্মম ভাবে। সুলেমান ও ওসমান, মির্জা সুনাম (বাংলার নবাব ইসলাম খানের সেনাপতি ১৬০২ খ্রি:), হাসিম খান (১৬০৮ খ্রি:), কেপোদাসমারু (এক দুর্ভাগা রাজপুত জায়গিরদার) কল্যাণ মাল্লা মুকারম খান (১৬১২ খ্রি:) ইত্যাদি। এ হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে ভক্তের ভগবানকে রক্ষার লড়াই। ভক্তি নিষ্ঠা ত্যাগ শৌর্যের অনন্য কাহিনী। মারাঠা রাজত্বে (১৭৫২ খ্রি:) অবস্থার পরিবর্তন হয়। অগণিত ওড়িশাবাসী ভক্ত একটু শান্তি অনুভব করে। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর ওড়িশা ব্রিটিশ অধিকারে আসে। আপাতভাবে তারা মন্দিরের কোনও ক্ষতিসাধন করেননি, বরং মন্দির পরিচালনা ও পূজার্চনার সুব্যবস্থায় নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু পরোক্ষে আক্রমণ করেছে মিশনারিগণ রথযাত্রার সম্পর্কে কদর্য ভাষায় কুৎসা প্রচার করে। এ কাজটির মূল হোতা ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের যাজক ক্লডিয়াস বুকানন। উইলিয়াম ব্যাম্পটন নামে এক ইংরেজ মিশনারি ১৯০৩ সালে পুরীতে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন— 'অদ্ভুত চেহারার জগন্নাথের একদিন পতন ঘটবেই...।' যুগ যুগ ধরে নিরন্তর পুরীর মন্দিরের উপরে আক্রমণের পেছনে কারণ কী ছিল? (১) মন্দিরের অতুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন, (২) হিন্দু ভারতের মর্মস্থলে তাদের বিশ্বাসে আঘাত করা, তাদের শ্রদ্ধাকেন্দ্রকে অসম্মানিত করে সাধারণ মানুষের মনোবল ভেঙে দেওয়া। এতসব সত্ত্বেও জগন্নাথ দর্শনে ভক্তপ্রবাহের শান্তি নেই। ভারতবর্ষের সাধক চূড়ামণি ধর্মাচার্যগণ একবার না একবার সকলেই জগন্নাথ দর্শনে এসেছেন--- শঙ্করাচার্য, মাধবাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মা আনন্দময়ী এমন কত বিভূতি! জৈন, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ভাবপ্রবাহের এক অবিমিশ্র রূপ দেখি পুরীধামে। জাতি বর্ণ ভাষা বেশ উচ্চ নীচ সকল বিভেদের উর্ধ্বে উঠে সকল মতের সমন্বয় সাধনের এক তীর্থ ক্ষেত্র জগন্নাথ পুরী। এই শাশ্বত সত্যের কেন্দ্রভূমি, সাধনভূমি তাই এমন অজেয় শক্তি সমন্বিত। পতিতপাবন ভগবানের রথের দড়িকে স্পর্শ করে সহস্র ভক্তবৃন্দ যখন বলে ওঠে— 'জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে...'; তখন যে দিব্যভাব আকাশ বাতাস আন্দোলিত করে সমগ্র জগতকে ব্যাপ্ত করে, সে দিব্যভাবের স্পর্শ লাভে আজও রথযাত্রায় উন্মুখ হয়ে থাকে বিশ্ব। এক অমোঘ আকর্ষণে সকলে ছুটে চলে জগন্নাথ ধামের দিকে। ▌

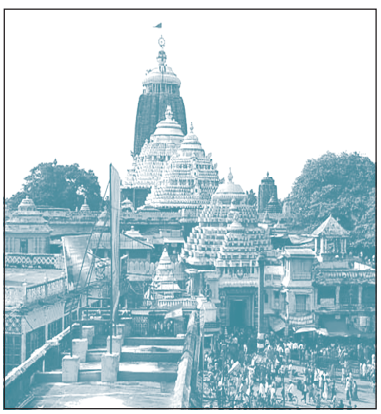

জগন্নাথ পুরী শাশ্বত সত্যের কেন্দ্রভূমি, সাধনভূমি তাই এমন অজেয় শক্তি সমন্বিত।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

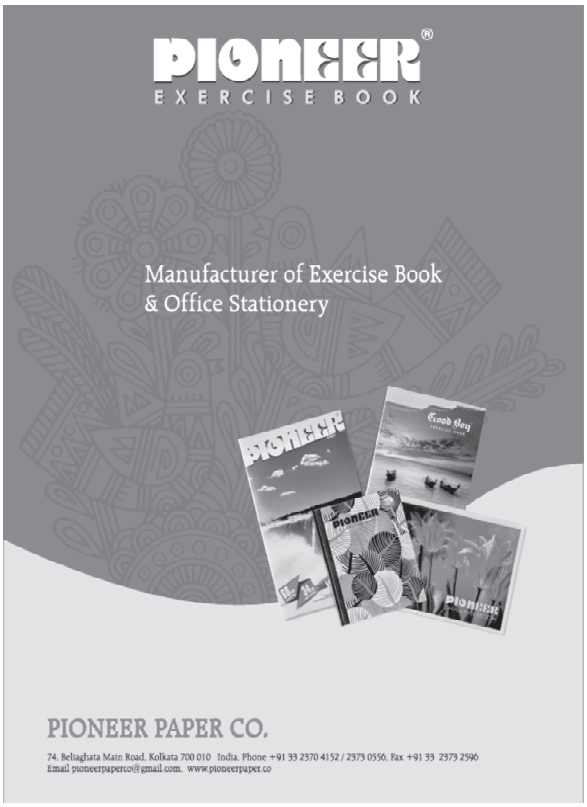

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

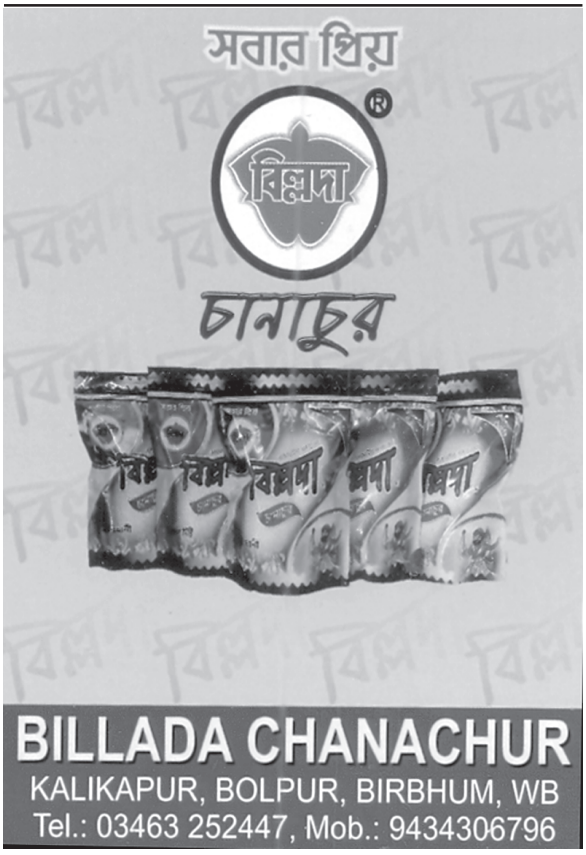

দু' হাজার ঊনিশ

প্রবাল চক্রবর্তী

গতকাল সারাদিন সারারাত জেহাদিদের রণহুংকার শোনা গেছে গ্রামের সীমান্তের ওপার থেকে। হায়েনার দল সেখানে বসে আছে ওঁত পেতে। রাত পোহালেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে গ্রামটার ওপর। টাঙ্গি আর তিরধনুক নিয়ে স্কুলবাড়ির ছাদে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছিল ভাস্কর আর পরন্তপ।

আজ ৫ জুন ২০২১, এখন মাঝরাত। আগামীকাল ভোরে 'আজাদ বাংলা' ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হবে।

এ অঞ্চলের গুটিকয় হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলোর মধ্যে একটা হলো এই ফুলেশ্বরী। কিন্তু আর বেশিদিন এমনটি থাকছে না। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা 'আজাদ' হতে যাচ্ছে আজ রাত পোহালে। তার সঙ্গেই মৃত্যু হতে যাচ্ছে ফুলেশ্বরী গ্রামের। গত ক'মাস ধরে এক এক করে প্রায় সব গ্রামবাসীই চলে গেছে পশ্চিমদিকে। সহায়-সম্বলহীন নিঃস্ব অবস্থায়। কাটিহার, পূর্ণিয়া পেরিয়ে আরও পশ্চিমে। রয়ে গেছে কয়েকঘর গ্রামবাসী, যারা এখনো গ্রাম ছেড়ে যেতে নারাজ। যেমন, পরানখুড়ো। গ্রামের স্কুলের শিক্ষক। বলেছে, এ গ্রামেই আমার জন্ম। আর যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, জন্মভিটে ছেড়ে নড়বো না। আর আছে মালতীর মা। মালতী হারিয়ে গিয়েছিল দু' হাজার ঊনিশের

গ্রীষ্মে। না, হারিয়ে যায়নি। পাশের গ্রামের জেহাদিরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। তারপর থেকেই অন্নজল প্রায় ত্যাগ করেছে বুড়ি। কত করে সবাই বললো, এখন গ্রাম না ছাড়লে কবে ছাড়বে। বুড়ি খালি বলে, আমি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে মালতীর কী হবে? ও যখন ফিরে আসবে, আমাকে কী করে খুঁজে পাবে?

আর রয়ে গেছে ভাস্কর-পরন্তপের মতো কিছু বাউন্ডুলে ছেলেপিলে। তারা ঠিক করেছে, বিনাযুদ্ধে গ্রাম ছেড়ে দেবে না।

আজাদি। ভারতের নতুন প্রধান সেই নামদার সাহেবজাদার খুব প্রিয় এই শব্দটা। সবার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই, এটাই ওঁর দাবি। তালেগোলে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতায় এলেন উনি ২০১৯ সালে। সঙ্গে তিরিশটি দলের সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা জোট। সে জোটের প্রতিটি নেতাই আপন রাজনৈতিক পরিবারের শক্তিতে বলীয়ান, প্রত্যেকেই একেকজন সাহেবজাদা-সাহেবজাদি। ভারতবর্ষ দেশটা ওদের কাছে মাতৃভূমি নয়, মস্তবড় এক মৌমাছির চাক। সেই চাকটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টুকরো টুকরো করে ভেঙে ভাগাভাগি করে বেচে দিয়ে ধনবান হওয়াই ওদের একমাত্র লক্ষ্য।

তারপর থেকে গত দু'বছরে দেশের অনেকগুলো অংশই তো আলাদা হয়ে গেল। প্রথম আজাদি এসেছিল কাশ্মীরে। সেই আজাদির পনেরো দিনের মধ্যেই বাগদাদের নব্য-খলিফার সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে গেল কাশ্মীর। প্রতিবাদ করেছিল সেখানকার কিছু সুফি সাধক। জবাবে খলিফার বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকা

থেকে সুফিবাদের সব চিহ্ন মুছে ফেললো, মাত্র এক রাতের মধ্যে। কেউ টু'শব্দটিও করেনি। যারা আজাদি চেয়েছিল, তারাও না। কে জানে, বাগদাদের দাসত্বই হয়তো প্রকৃত আজাদি। পাঁচটি জেলার 'আজাদ বাংলা'-ও যে সেই আজাদির পথেই হাঁটবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

শেষরাতে একটা হলুদ ঘোলাটে চাঁদ উঠলো। চারিদিকের মিশকালো অন্ধকার কিছুটা কাটলো তাতে।

''সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল রে!'' বলল পরন্তপ।

কোনো জবাব দিল না ভাস্কর।

''গোলমালটা কোথায় হলো বল তো?'' আবার বলল পরন্তপ।

''দু' হাজার উনিশ,'' অস্ফুটস্বরে বললো ভাস্কর।

''হুঁ,'' বললো পরন্তপ, ''সেই ইলেকশনটা...সব কেমন যেন ভুলভাল হয়ে গেল। সব্বার কি একসঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন, যে সবাই মিলে নিজেদের পায়ে এতবড় কুড়ুল মারলো?''

''হবে না?'' বললো ভাস্কর, ''ভ্যাটিকান, কমিউনিস্ট, জেহাদি, নকশাল, পাকিস্তান, চীন, কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা— সবাই মিলে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছিল ওই ভালো লোকটার পেছনে। চিৎকারে তখন কান পাতা দায়। তাই তো...সবকিছু গুলিয়ে গেল। ভালো লোকটাকে তাড়িয়ে ছাড়লো সবাই মিলে।''

''বাজে অজুহাত!'' বললো পরন্তপ।

''সত্যি বলতে কী, কোনো অজুহাতই কি যথেষ্ট, নিজেদের পায়ে এতবড় কুড়ুল মারার জন্য?'' বললো ভাস্কর। দূরে কোথাও একটা মোরগ ডেকে উঠলো। পুব আকাশে সিঁদুরের ছোঁয়া। সীমান্তের তেপান্তরের মাঠটার ওপারে একটা হৈচৈ শোনা গেল। মনে হল, একদল লোক ধেয়ে আসছে স্কুলবাড়ির দিকে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ভাস্কর। শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো টাঙ্গিটা। আসছে, লোকগুলো এদিকেই আসছে। স্কুলের সদর দরজা পার হয়ে উঠোনের কাছে এসে পড়েছে। টাঙ্গি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লো ভাস্কর। সবার সামনে যে লোকটা ছিল, তার ঘাড়ে। আতঙ্কে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো লোকটা।

লোক? এ তো একটা বাচ্চা ছেলে! আশেপাশের লোকগুলোকে এবার ভালো করে দেখলো ভাস্কর। সবাই কিশোর, বয়স্ক। পরনে স্কুল ইউনিফর্ম। মুখগুলো চেনা, এই গ্রামেরই ছেলেপিলে এরা।

''তোরা এখানে কী করছিস?'' চেঁচিয়ে বললো ভাস্কর, ''এখনো গ্রাম ছেড়ে যাসনি? পালা শিগগির!''

''পালাবো? কেন পালাবো?''

''না হলে যে ওরা তোদের সবাইকে মেরে ফেলবে!''

''ওরা? ওরা কারা?''

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল পরানখুড়ো।

''বাচ্চাগুলোকে ভয় দেখাচ্ছিস কেন?'' ধমকে উঠলো পরানখুড়ো, ''এত সকালে এখানে স্কুলবাড়িতে কী করছিস তোরা?''

''আমরা তো...'' আমতা আমতা করে বললো ভাস্কর, ''গ্রামরক্ষার জন্য...''

''গ্রামরক্ষা! কার থেকে রক্ষা?'' আবার ধমকে উঠলো পরানখুড়ো, ''দুঃস্বপ্ন দেখছিলি? নাকি স্কুলের ছাদে উঠে নেশা ভাং করছিলি? শিগগির পালা এখান থেকে, না' হলে তোর মা'কে বলে দেবো!''

পরানখুড়োর পেছন-পেছন বাচ্চারা হইচই করতে করতে স্কুলে ঢুকে পড়লো। যে ছেলেটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল ভাস্কর, সেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাদের পিছু নিলো। যাবার আগে ভাস্করের দিকে একবার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল। হতভম্ব ভাস্কর বসে রইলো মাটিতে।

পরন্তপ সিঁড়ি বেয়ে ছাদ থেকে নেমে এল।

''ওঠ,'' বললো ও, ''চল, বাড়ি চল!''

''ব্যাপারটা কী হলো বল তো?'' বললো ভাস্কর।

''হ্যাঁ, কী অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলি বল তো! ছাদ থেকে ওরকম লাফিয়ে পড়লি কেন? দুঃস্বপ্ন দেখছিলি নাকি?''

''দুঃস্বপ্ন! তার মানে?'' বিস্ময়ের ঘোরে বললো ভাস্কর।

''মানে তো তুই বলবি!'' ঝাঁঝিয়ে উঠলো পরন্তপ, ''হঠাৎ ওরকম হাঁউমাঁউখাঁউ করে...''

''আজ কত তারিখ রে?'' জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

''সেটাও ভুলে গেছিস? ৬ জুন, ২০১৮।''

''দু' হাজার আঠারো?'' চমকে উঠলো ভাস্কর, ''ঠিক বলছিস? দু' হাজার একুশ নয়?''

''তুই কি পাগল হলি? সন-তারিখ গুলিয়ে ফেলছিস? ওই দ্যাখ, হেডমাস্টারের ঘরের সামনের ক্যালেন্ডারটা।''

হতভম্ব ভাস্কর বসে রইল সেখানেই।

''কীরে, চল!'' আবার তাড়া দিল পরন্তপ, ''এখন না ফিরলে তোর মা তোকে খুঁজতে বেরোবে।''

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো ভাস্কর। গুটি গুটি পায়ে এগোলো গ্রাম-সীমান্তের তেপান্তরের মাঠটার দিকে। নিজের বাড়ি যেদিকে, তার ঠিক উল্টোদিকে।

দুঃস্বপ্ন। শুধুই দুঃস্বপ্ন। সত্যি নয়।

দু' হাজার ঊনিশের তবে আরও এক বছর বাকি আছে। এই এক বছরে অনেক কিছুই করা যায়। মালতীকে জেহাদিদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ফুলেশ্বরী গ্রামটাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানো যায়। আর এই জেলাটাকে...

দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করলো ভাস্কর। দু' হাজার ঊনিশের ভোটের ফলাফলটাকে বদলে দিতে হবে। আগামী এক বছরে। ওটা যে শুধুমাত্র ভোট নয়। ওটার ওপর অনেকের জীবন-মরণ নির্ভর করে আছে। ▮

পণ্ডিত দীনদয়ালজী

শত শত প্রণাম

H. K. Chaudhuri

A Well Wisher

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমন একজন মহাপুরুষ যাঁর জন্য বাঙালি চিরদিন গর্ব অনুভব করবে। নারী শিক্ষার বিস্তার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণের প্রচেষ্টা, মুক্তহস্তে গরিবদের দান ও সেবা, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, পরোপকার, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অতুলনীয় পিতৃ-মাতৃভক্তি— সবদিক দিয়ে তাঁর মতো আদর্শ পুরুষ এযুগে বিরল। মা-বাবার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কীরকম থাকা উচিত তা বিদ্যাসাগরের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করে বেরনোর দিন পনেরো পরই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃসাধ্য শ্রম ও অসহনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে বড়ো হতে শিখিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর দশটাকা মাইনের চাকরি করতেন। চাকরি পেয়েই তিনি বাবাকে বিশ্রাম দিতে চাইলেন। ছেলের অনুরোধে ঠাকুরদাস চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে থাকতে শুরু করলেন। সংসার চালানোর জন্য সব টাকাই বিদ্যাসাগর বাবাকে দিতেন। বিদ্যাসাগরের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবাই গ্রামেই থাকতেন।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক তখন তাঁর ছোটো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁর মা ভগবতী দেবী তাঁকে বাড়ি আসতে

বললেন। কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের কাছে তিনি ছুটির জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু মার্শাল সাহেব কাজের চাপের বাহানায় ছুটি দিতে চাইলেন না।

মা ভাইয়ের বিয়েতে আসার জন্য বলেছেন, আর তিনি যেতে পারছেন না— ক্ষোভে দুঃখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। পরদিন সকালেই পদত্যাগপত্র লিখে তিনি মার্শাল সাহেবের ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘ আমার মা যখন আমাকে বাড়ি যেতে বলেছেন তখন আমাকে যেতেই হবে। মায়ের আদেশ আমি অমান্য করতে পারব না। আপনি যদি ছুটি দিতে না চান তাহলে এই নিন পদত্যাগপত্র। আমি আর চাকরি করব না।’ মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের অটুট মাতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন এবং খুশি হয়ে ছুটি মঞ্জুর করলেন।

তখন বর্ষাকাল। কলকাতা থেকে রওনা হতেই দেরি হয়ে গেছে। ভরা দামোদরের তীরে যখন পৌঁছলেন তখন বেশ রাত। তার উপর ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পাড়ে কোনও মাঝি নেই। অগত্যা মাকে স্মরণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার কেটে ওপাড়ে উঠলেন। দুপুর রাতে বাড়ি পৌঁছলেন। মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য তিনি অসাধ্য সাধন করলেন।

আর একবার তিনি মায়ের জন্য একটি ভালো লেপ তৈরি করিয়ে বাড়িতে পাঠালেন। লেপটি পেয়ে মা ভগবতী দেবী ছেলেকে জানালেন গ্রামের বহু মানুষ শীতে খুব কষ্ট পায়। তাদের গায়ে দেওয়ার কাপড় পর্যন্ত নেই। এই অবস্থায় কী করে তিনি লেপ ব্যবহার করবেন। বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সবার জন্য লেপ কিনে পাঠিয়ে দিলেন। এই হলো বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি। কথায় আছে —‘মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতী তত।’

রাজদীপ মিশ্র

ভারতের পথে পথে

ভদ্রাচলম্

অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরী নদীর দক্ষিণ পাড়ে ভদ্রাগিরি পাহাড়ে শ্রীরামচন্দ্রস্বামী মন্দিরের জন্য ভদ্রাচলম্ বিখ্যাত। মন্দিরে রয়েছে তীর,ধনুক, শঙ্খ, চক্রধারী চতুর্ভুজ শ্রীরামচন্দ্র, সীতামাতা ও লক্ষ্মণের বিগ্রহ। মন্দিরের শিখর চূড়োয় ৩০ টনের বিমান। তার মাথায় রয়েছে গোদাবরী থেকে পাওয়া সুদর্শন চক্র। মূল মন্দির ঘিরে রয়েছে ২৪টি ছোটো ছোটো মন্দির। তাতে ৪৮ রকমের বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। কথিত, লঙ্কার পথে শ্রীরাম এখানেই গোদাবরী পার হন। সপ্তদশ শতকে কতুবশাহির তালুকপ্রধান গোপাল্লা পরবর্তীকালে রামভক্ত রামদাস মন্দিরগুলির সংস্কার করেন। বৈকুণ্ঠ একাদশী ও রামনবমী উৎসবে দূরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। সারা দিন চলে পূজা অর্চনা। এছাড়া ৩৬ কিলোমিটার দূরে আছে পর্ণশালা আশ্রম। জনশ্রুতি, বনবাসের সময় ১৪ বছর এখানেই ছিলেন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। এই আশ্রম থেকেই রাবণ হরণ করে সীতামাতাকে।

জানো কি?

- পৃথিবীর আয়তন ৫১,০১,০০,৫০০ বর্গ কিলেমিটার।
- স্থলভাগের আয়তন ১৪,৮৯, ৫০৩২০ বর্গ কিলোমিটার।
- পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ হলো এশিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্টিকা।
- পৃথিবীতে মোট দেশের সংখ্যা ২৩০টি।
- পৃথিবীর ৫টি মহাসাগর হলো প্রশান্ত অতলান্তিক, ভারত, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর।

ভালো কথা

আমার প্রথম রথ টানা

রথযাত্রার দিন প্রতি বছর আমি বাবার সঙ্গে রথ দেখতে বের হই। সেদিন পাড়ার ছোটোরা কাঠের , কাগজের রথ বানিয়ে রথের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলে। কেউ কেউ কাঁসর-ঘণ্টা বাজায়, কেউ প্রসাদ দিতে থাকে। ওদের দেখে আমারও খুব ইচ্ছে করত রথ টানতে। এবার সেই ইচ্ছা আমার পূর্ণ হলো। আমাদের পাড়ার এক বন্ধু আমাদের বলেছিল আমি রথ বের করব তোদের থাকতে হবে। সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। রথযাত্রার দিন আমরা প্রথম সেই রথ বের করলাম। যার রথ সে বলল , আমি রথের দড়ি টানব। আমি বললাম, আমি কাঁসর বাজাব। আর একজন বলল সে প্রসাদ দেবে। একজন বলল সে ঘণ্টা বাজাবে। আমরা রথ টানা শুরু করলাম। খুব মজা হচ্ছিল। আমার বাবা সাইকেলে বড় রথ দেখতে যাচ্ছিল। ঘুরে এসে বলল, বড় রথটা এদিকেই আসছে। তোরা তোদের রথ ঘুরিয়ে নিয়ে বড় রথের দিকে চল। আমরা বাবার কথামতো ওদিকে গেলাম। তিনটে বড় রথ দেখলাম। তারপর আমরা রথ নিয়ে বাড়ির রাস্তা ধরলাম। আমার ভাইও রথ টানল, ঘণ্টা বাজাল। দারুণ মজা হলো।

আরাত্রিকা মিশ্র, দ্বিতীয়শ্রেণী, তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর।

(বি. দ্র. : ৩০ জুলাই ভালো কথা'য় ভুলবশত 'আমার অসম ভ্রমণ' হয়েছে। হবে 'লিচুগাছে জাল নয়'।)

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

ইলিশ

সায়ণ সরদার, নবমশ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিকে বলে ইলশেগুড়ি
তাইতো বাজারে এখন ইলিশ ভুড়িভড়ি।
ইলিশের নানান পদ রাঁধে পদিপিসি
ছোটো বড়ো তাই খেয়ে হয় খুবই খুশি।

খোকা ইলিশ ধরা মানা আদেশ সরকারি
ভুল হলে জরিমানা হবে পাইকারি।
তবু কিন্তু খোকা ইলিশ আসে বাজারে
তাতে ইলিশ হারিয়ে যাবে—আহারে!

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ১৯

অম্পক নামে এক যোদ্ধা দ্রুত অভিমন্যুর দিকে যায়।

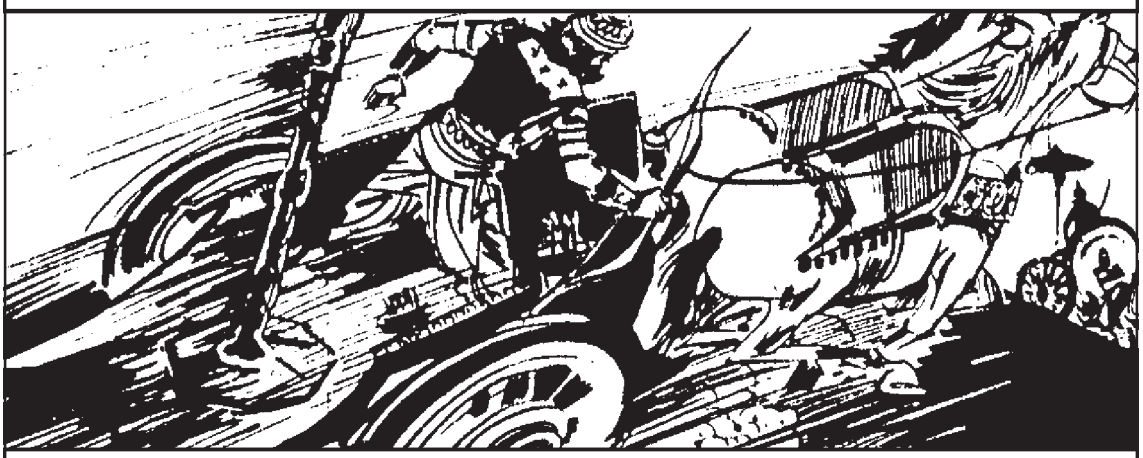

অভিমন্যুর হাতে সে নিহত হয়।

কর্ণ অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হয়।

কিন্তু তাঁর বর্ম বিদ্ধ হয়।

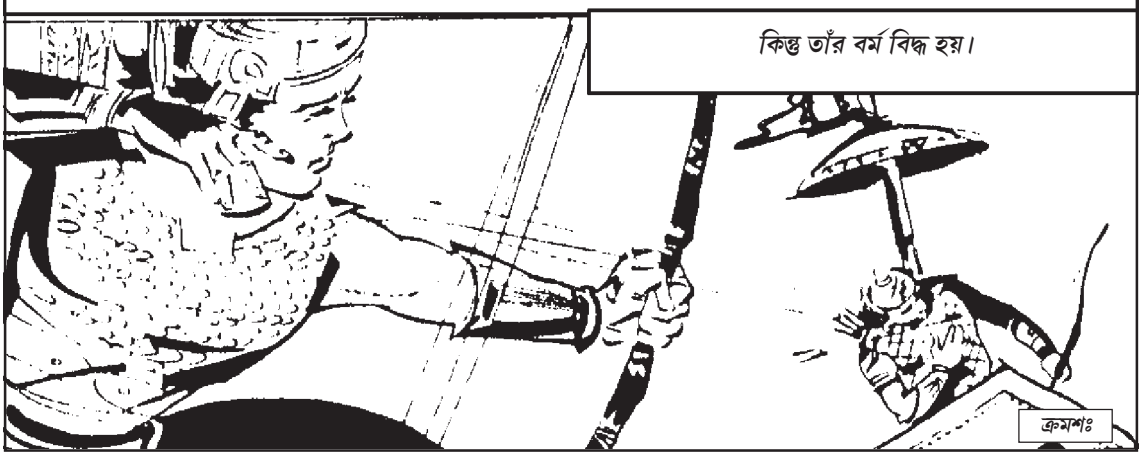

বেদনাহত ৬ আগস্ট

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ইতিহাসে কঠিন বজ্রপাত হয়েছিল, যাতে ৪টি নিবেদিতপ্রাণ উগ্রপন্থীদের হাঁড়িকাঠে বলি হয়েছিল। এই মর্মান্তিক দুঃখ ও বেদনা প্রতি বছর প্রতি দিন পলে পলে স্বয়ংসেবকদের দগ্ধ করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তিনজন প্রচারক— সুধাময় দত্ত, দীনেন দে, শুভঙ্কর চক্রবর্তী এবং একজন কার্যকর্তা— তৎকালীন পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ শ্যামল সেনগুপ্ত এন এল এফ টি জঙ্গিদের দ্বারা অপহৃত হন এবং দু'বছর পর তাদের দ্বারা নিহত হন।

ত্রিপুরার ধলাই জেলার কাঞ্চনছড়া কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে সেদিন তাঁরা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে অন্যত্র সঙ্ঘের কাজের জন্য যাওয়ার কথা ছিল। সুধাময়দা মাত্র ছ'দিন আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় বিভাগ প্রচারক হিসেবে গেছেন। ভাগ্যের পরিহাস , কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার কয়েকদিন পরেই খ্রিস্টান প্রভাবিত কয়েকজন জঙ্গি তাঁদের অপহরণ করে। দু'বছর ধরে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রেখে অমানবিক অত্যাচার করে তাঁদের হত্যা করা হয়। তাঁদের দেহ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। তাঁদের উদ্ধারের জন্য ত্রিপুরার বামপন্থী সরকার কোনও রূপ সহযোগিতা করেনি, কিন্তু কেন্দ্রে সহমর্মী সরকার থাকাতেও কোনও সুরাহা হয়নি। এই ঘটনা শুধুমাত্র তাঁদের পরিবারকে আঘাত করেনি, পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশের স্বয়ংসেবক পরিবারকে আহত করেছে। আমরা যারা ওই চারজনকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম, প্রতিনিয়ত তাঁদের মুখচ্ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কারও দেখা হলে আমরা লজ্জিত হই, কারণ আমরা তাঁদের রক্ষা করতে পারিনি।

কেরলে সঙ্ঘকাজের জন্য, হিন্দু সমাজের রক্ষার জন্য স্বয়ংসেবকদের দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হচ্ছে। এজন্য কয়েকশো স্বয়ংসেবক প্রাণ দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গেও মাঝে কয়েকবছর এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার ঘটনার প্রেক্ষাপট আলাদা, পিছন থেকে ছুরি মারার মতো। দু'বছর পর তাঁদের হত্যা করার খবর আসার পর তৎকালীন পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী সুদর্শনজী কয়েকজন কার্যকর্তাকে নিয়ে তাঁদের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দু'ঘণ্টা ধরে তাঁদের পরিবারের সকলের সঙ্গে দুঃখ ও শোক ভাগ করে নিয়ে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। মেদিনীপুরে সুধাময়দার বাড়িতে যখন আসেন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সুধাময়দার বাবা ও মা তখন দু'জনেই বেঁচেছিলেন। বৃদ্ধ বাবা সেই কঠিন আঘাতেও সুদর্শনজীর পাশে বসে কথা বলেছিলেন। কিন্তু মা নির্বাক ছিলেন। সেই দৃশ্য আজও আমাকে পীড়া দেয়। এত দুঃখ বেদনার মধ্যেও তখন স্বয়ংসেবক বা স্বয়ংসেবকদের পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ বা হতাশা দেখা যায়নি। তারপরেও পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রচারক হিসেবে সহেসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের পরিবারের কেউ তাতে আপত্তি করেনি।

আজ সেই চার বিদেহী আত্মাকে স্মরণ করে শতকোটি প্রণাম জানাই এবং তাঁদের আত্মীয় ও পরিজনদের সমবেদনা জানাই। আমাদের প্রতিজ্ঞা— 'ধরার ধূলিতে দেব না হারাতে বীরের রক্তধারা'। ▮

পরলোকে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির রেখা পাল

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ রেখা পাল গত ১৯ জুলাই কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

১৯৮৯ সালে কলকাতায় সঙ্ঘের

প্রাদেশিক কার্যালয় কেশব ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের সময় তাঁর ভাইপো প্রবীর ও সম্রাটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বংয়সেবক সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়। ওই বছরই তিনি উলুবেড়িয়ায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা বর্গে যোগদান করেন । প্রথাগত শিক্ষা শেষ করে তিনি বামপন্থার সমর্থনে প্রান্তিক জনবিকাশ সমিতির মাধ্যমে ফুটপাথবাসী শিশুদের শিক্ষাদানের কাজে যুক্ত ছিলেন। সমিতির সঙ্গে যোগাযোগের পর সেই কাজ ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৯২ সালে রামমন্দির আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শিশুশিক্ষা তাঁর প্রথম পছন্দের বলে কলকাতার দত্তাবাদ অঞ্চলে সংস্কারকেন্দ্র স্থাপন করে দীর্ঘদিন সেবাকাজে ব্রতী ছিলেন।

২০০০ সালে সমিতির কার্যালয় স্থাপন হওয়ার পর কার্যালয় প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। অবিবিহিতা রেখা পাল প্রচারিকা না হয়েও পূর্ণ সময়ের কার্যকর্ত্রী ছিলেন। সমিতির পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন সংস্থা 'সেবিকা প্রকাশন' তাঁর হাতেই ধীরে ধীরে উন্নীত হয়েছে।

২০১৫ সালে তিনি কর্কটরোগে আক্রান্ত হন। অস্ত্রোপচারের পরও তিনি মথুরায় সমিতির অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। গত ছ'মাস তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। গুরুতর অবস্থায়ও সমিতির কাজের প্রতি তাঁর উৎসাহ কমেনি। বাড়িতে বসেই ফোনে শেষ দিন পর্যন্ত সম্পর্কের কাজ করেছেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পর দিশা আই হসপিটালে তাঁর নেত্রদান করা হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক প্রদীপ দে'র বৌদি বাসবী দে গত ১১ জুলাই কলকাতার বিজয়গড়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ২ মেয়ে, ২ জামাই ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, মাত্র ৬ মাস আগে তাঁর স্বামীও ইহলোক ত্যাগ করেন।

* * *

উত্তর মালদা জেলার চাঁচল নগরের পূর্বতন নগর সঙ্ঘচালক স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শকুন্তলা চট্টোপাধ্যায় গত ১১ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও

নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর ৪ পুত্রই স্বয়ংসেবক। মধ্যমপুত্র জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর মালদা জেলা সভাপতি। প্রয়াত শকুন্তলা চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

* * *

কাটোয়া জেলার কালনা নগরের শারীরিক প্রমুখ নারায়ণচন্দ্র দাস, সম্পর্ক প্রমুখ নির্মল চন্দ্র দাস ও কৃষ্ণচন্দ্র দাসের মাতৃদেবী সন্ধ্যারানি দাস গত ৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কাটোয়া জেলার ধর্মজাগরণ প্রমুখ পঙ্কজ মাহাত'র পিতা হাজারীলাল মাহাত গত ৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি ৬ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক তথা মালদহ বিভাগের পূর্বতন সঙ্ঘচালক প্রয়াত অহীন্দ্রকুমার দে'র সহধর্মিণী বাসনা দে বার্ধক্যজনিত রোগে গত ২১ জুলাই মালদহ

নগরের গোলাপট্টি বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলার মোহিতনগর শাখার স্বয়ংসেবক ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক কার্তিক বিশ্বাসের মাতৃদেবী তথা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কার্যবাহিকা শ্রীমতী পূর্ণিমা বিশ্বাসের শাশুড়িমা, সেই সঙ্গে খণ্ড কার্যবাহ সুদর্শন বিশ্বাসের ঠাকুমা গত ১৬ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

‘কংগ্রেস মুসলমানদের দল’ বলে রাহুল কোনও অন্যায় করেননি

কমল মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি রাহুল গান্ধী কংগ্রেসকে মুসলমানের দল বলায় অনেক সমালোচনা বা আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কথাটা কি একেবারেই মিথ্যা?

কংগ্রেস দল প্রথম মুসলমানদের হয়ে কাজ করে যখন গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন। যা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপার। ভারত যার সঙ্গে কোনো প্রকারেই যুক্ত নয় তাকে গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত করলেন এবং মুসলমানদের মসিহা হবার চেষ্টা করলেন।

১৯২১ সালের শেষভাগে কেরলের মালাবার অঞ্চলের মুসলমান মোপলারা খিলাফত আন্দোলন শুরু করে হিন্দুদের উপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা জিহাদের একটা প্রক্রিয়া মাত্র। এই ব্যাপারে ড. আম্বেদকর লিখেছেন--- ‘এটা হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা নয়। মোপলারা হিন্দুদের উপর অকথ্য ও সীমাহীন বর্বরতা চালিয়েছিল যতক্ষণ না সেনাবাহিনী এসে ওই অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার না করে।’

এই ব্যাপারে গান্ধীজী বলেছিলেন, সাহসী ও ধর্মভীরু মুসলমানরা তাদের বিবেচনায় ধর্মীয় পন্থায় ধর্মের জন্য লড়াই করেছিলেন (Brave-God fraring Moplas who were fighting for waht they considered as religion and in a manner which they consider religious)। ১৯২৩ সালে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীতে কংগ্রেস বিখ্যাত হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্পাদন করল। একে বেঙ্গল প্যাক্টও বলা হয়ে থাকে। চিত্তরঞ্জন দাশ এটা করেছিলেন মুসলমান প্রতিনিধিদের সাহায্য পাবার আশায়। আগে নাকি কোনও প্রগতিমূলক কাজ করা যাচ্ছিল না। এই চুক্তির ফলে আইনসভাগুলিতে মুসলমান গরিষ্ঠতার অনুপাতে সদস্যসংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হলো। তাছাড়া এই চুক্তির ফলে সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের ৫৫ শতাংশ এবং হিন্দু ও অন্যান্যদের ৪৫ শতাংশ সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা এবং এই চুক্তির ফলে মসজিদের সামনে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রাও নিষিদ্ধ হয় না। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য গোহত্যা হলে তাতে বাধা দেওয়া চলবে না। তবে হিন্দুদের মনে আঘাত লাগে এমন স্থানে গোহত্যা করা চলবে না।

এই চুক্তির ফলে মুসলমানদের একটি বড় অংশ খুশি হলো। কিন্তু শিক্ষিত ও জমিদার শ্রেণীর হিন্দুরা এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বিপ্লবী দলগুলি চিত্তরঞ্জন দাশের উপর কংগ্রেসের ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল তারাও অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। গান্ধীবাদী নেতা ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষও বক্তৃতায় বলেছিলেন মুসলমানদের নিকট আত্মসর্মপণ করে আমরা তাদের একটার পর একটা দাবি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছি। (দি বেঙ্গলি ২৫ এপ্রিল, ১৯২৭)

তারপর ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার চুক্তি পাশ হলো। তার ফলে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভোট হয়। এই ভোটে মুসলমানরা মুসলিম লিগকে এবং ফলজুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিকে ভোট দেয়। হিন্দুরা কংগ্রেসকে ভোট দেয়। তখন যদি হক সাহেব ও কংগ্রেসের যুক্ত সরকার গঠন হতো তাহলে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগ শাসন ক্ষমতায় আসতে পারত না। কংগ্রেস যদিও হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত কিন্তু তারাও হিন্দুদের কথা চিন্তা করল না, মুসলমান বা তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করল। তখন সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভাও ভোটে অংশ নিয়েছিল; কিন্তু হিন্দুরা তাঁকে বা তাঁর দলকে সমর্থন করেনি। যাইহোক, মুসলিম লিগ ক্ষমতায় না থাকলে হিন্দুদের দুঃখ দুর্দশা শুরু হতো না। কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থই দেখে গেল। তখন কিন্তু বাংলায় শরৎচন্দ্র বোস, সুভাষচন্দ্র বোস নেতৃত্বে চলে এসেছেন। তাঁরাও কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করলেন না। এই ব্যাপারে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ‘কাকস্য পরিবেদনা’। ১৯৩৯ সালে মুসলিম লিগ পাকিস্তান গঠন ঘোষণা করায় ওই বছর বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সরকারি সহায়তায় গণহত্যা বা হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও অকথ্য অত্যাচার করে। কিন্তু কংগ্রেস এ ব্যাপারে কোনও প্রকার সক্রিয়তা দেখায়নি। ১৯৪১ সালে যখন ফজলুল হক মুসলিম লিগ সরকার থেকে সরে আসেন তখন তিনি কংগ্রেসকে অসাম্প্রদায়িক সরকার গঠন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কংগ্রেস কিন্তু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস ব্রিটিশকে অসহযোগিতা করবে বলে স্থির করেছে এবং তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। দিলে এই

ফঃ ৬

বাংলায় এত সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতো না বলেই বিশ্বাস করি। হকসাহেব শ্যামাপ্রসাদকে হিন্দুমহাসভার নেতা হিসাবে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সে আমন্ত্রণ স্বতস্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করলেন ও অর্থ দপ্তরের ভার নিলেন। কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ এবং তার প্রতিকারে সরকারের উদাসীনতায় ও খবর চেপে যাওয়ার চেষ্টায় সরকার থেকে পদত্যাগ করলেন। এই সরকারের পতন ঘটায় ব্রিটিশ আবার সুরাবর্দিকে ক্ষমতায় আনল এবং তিনি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি শুরু করলেন। যার ফলস্বরূপ বাংলা ছিনিয়ে নিয়ে পাকিস্তান গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারি প্ররোচনায় কলকাতায় ও তারপরে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা ও বর্বরোচিত অত্যাচার শুরু করলেন। ওই সময় গান্ধীজী বিহারে যেখানে হিন্দুরা সক্রিয়, সেখানে দাঙ্গা থামানোর জন্য অনশন শুরু করলেন কিন্তু কলকাতায় এলেন না বা দাঙ্গা থামানোর জন্য সচেষ্ট হলেন না। তারপর যখন কলকাতায় হিন্দু ও শিখরা বাঙালি বীর গোপাল মুখার্জি ওরফে গোপাল পাঁঠাকে নিয়ে মুসলমান গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, মুসলমানদের মারতে শুরু করল তখন গান্ধীজীর টনক নড়ল। তিনি কলকাতায় ছুটে এসে মুসলমানদের বাঁচাতে হিন্দুদের দাঙ্গা থামাতে বললেন। এই হচ্ছে গান্ধী ও কংগ্রেসের চরিত্র।

তারপর পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ইতিহাস তো অনেকেই জানেন। কংগ্রেস গোটা বাংলাকেই পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল সেখানে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাগ করে মুসলমানের মুখের গ্রাস থেকে কলকাতা তথা বাংলার পশ্চিমাংশ ও পূর্ব পঞ্জাবকে রক্ষা করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৫০ সালে আবার পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি প্ররোচনায় হিন্দুদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার, গণহত্যা ও নারীদের উপর বলাৎকার ও ধর্ষণ সংগঠিত হয়। কিন্তু নেহরু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার নীরব দর্শক হয়ে রইল। ফলস্বরূপ শ্যামাপ্রসাদ তার এই অমানবিক আচরণে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন ও হিন্দুদের পাশে দাঁড়ালেন। নেহরু লিয়াকত চুক্তি করে দায় সারলেন। কী সেই চুক্তি? দু'দেশের সরকার তাদের সংখ্যালঘুদের ধন, মান সম্পত্তি রক্ষা করবে। এর ফলে মুসলমানরা যারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে শুরু করল আর হিন্দুরা যারা ওদেশ থেকে এদেশে চলে এসেছিল তারা আর দানব ও পিশাচদের অত্যাচারের কথা চিন্তা করে ফিরে গেল না। আজ সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ৭-৮ শতাংশ।

দেশীয় রাজাদের ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি সেখানকার রাজাদের সম্মতি বা চুক্তিতে সম্ভব হয়ে ছিল যা ব্রিটিশরা রাজাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ প্রাথমিকভাবে ইতস্তত করার পর পাকিস্তানের আক্রমণে ভারত ভুক্তিতে সই করেছিলেন। সুতরাং অন্যান্য রাজ্য যদি ভারতের অঙ্গ হয় তাহলে কাশ্মীরও ভারতের অঙ্গরাজ্য। কিন্তু নেহরু রাজাকে পাত্তা না দিয়ে ভুঁইফোড় সাম্প্রদায়িক নেতা শেখ আবদুল্লাকে পাত্তা দিয়ে কাশ্মীরের জন্য আলাদা আইন, আলাদা সংবিধান, আলাদা পতাকা, আলাদা প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি অন্যায় আবদার মেনে নিলেন। শুধু তাই নয় পাকিস্তানি হানাদারদের তাড়িয়ে দেবার চরম মুহূর্তে যুদ্ধ থামিয়ে কাশ্মীর সমস্যাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গেলেন পাকিস্তানি মুসলমানদের সুবিধার্থে। তাহলে বলুন কংগ্রেস প্রথম থেকে মুসলমানদের স্বার্থ দেখে যাচ্ছে না? এর প্রতিবাদ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। এর প্রতিবাদে তিনি কাশ্মীরযাত্রা শুরু করলে তাঁকে বাধা দিয়ে ফাঁদে ফেলে অন্যায় ভাবে বন্দি করে অসহনীয় অত্যাচার করে চিকিৎসা না করিয়ে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া হয় যাতে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ তথা হিন্দুদের প্রতিবাদ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

তারপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। আমরা জানতাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার জনগণের উপর অত্যাচার করেছিল। যে পাশবিক অত্যাচার হয়েছে তার ৯০ শতাংশ হিন্দুদের উপর, সেটা ইন্দিরা গান্ধী জানতেন। কিন্তু তিনি এশিয়ার মুক্তিসূর্য হবার লোভে তেমন সক্রিয় ভূমিকা নিলেন না। তারপর থেকে সমস্ত দলই মুসলমানভাবাপন্ন মুসলমান হিতৈষী সেকুলারবাদী হয়ে গেল। এটা নেহরু ও মার্কসবাদীদের প্রভাব। কে কত মুসলমানদের খুশি করে তাদের ভোট পাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আটের দশকের শেষভাগে ফারুক আবদুল্লা সরকারের পতনের পর কাশ্মীরি মৌলবাদী উগ্রপন্থী মুসলমানরা কাশ্মীরের পণ্ডিতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও অকথ্য অত্যাচার করে। উল্লেখ্য, ফারুক আবদুল্লা যাবার আগে কট্টর মৌলবাদী উগ্রবাদীদের জেল থেকে ছেড়ে দেয় এবং তারাই এই অত্যাচার সংগঠিত করে। আজও কয়েক লক্ষ পণ্ডিত জম্মু ও দিল্লির আশপাশে উদ্বাস্তু হয়ে দিন কাটাচ্ছে। এজন্য কোনও কংগ্রেস সরকার বা সেকুলারবাদী নেতাদের বা দলকে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ করতে দেখি না। কোনও বুদ্ধিজীবীকে পদক ফেরাতে বা অসহিষ্ণুতার কথা উচ্চারণ করতে দেখি না। খবরের কাগজগুলিও আশ্চর্য রকমের চুপ। ফলে জনগণও এই খবর জানে না বা জানতে চায় না। কংগ্রেসের বিষ তাঁদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে গেছে। মনমোহন সিংহ তো বলেই ফেলেছিলেন ভারতের সম্পদের উপর মুসলমানদের অগ্রাধিকার। রাজীব গান্ধীর আমলে মুসলমানদের বিশেষ করে পুরুষ মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য শাহাবানুর কেসের ব্যাপারে আইন পাস করে মুসলমানদের সুবিধা ও মহিলাদের স্বাধীনতায় কুঠারাঘাত করেছিলেন। সুতরাং মুসলমান তোষণ কংগ্রেসের ডিএনএ-তে বর্তমান, তা সকল সেকুলারবাদী নেতাদের বা দলে সংক্রামিত হয়ে গেছে। সুতরাং কংগ্রেস মুসলমানদের দল বলে রাহুল গান্ধী অন্যায় কিছু বলেননি। সত্য কথাটাই বলে ফেলেছেন। নরেন্দ্র মোদীও কংগ্রেস পার্টিকে পুরুষ মুসলমানদের দল বলে যথার্থ কথাই বলেছেন। ■

শ্রাবণমাসের কৃষিকাজ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

আমনধান : শ্রাবণ মাসের মধ্যে মূল জমি তৈরি করে আমনধানের চারা রোয়ার কাজ শেষ করে ফেলুন। জমি তৈরি করতে শেষ চাষের সময় বিঘা প্রতি কমপক্ষে ১০ কুইন্টাল জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। পারলে বিঘা প্রতি আরও দু' চার কুইন্টাল জৈবসার দিলেও মন্দ হয় না। আর দিন রাসায়নিক সার বিঘা প্রতি ৩.৫ কেজি, নাইট্রোজেন বা ৭.৭ কেজি ইউরিয়া, ৫.৩ কেজি ফসফেট বা ৩২.৩ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৫.৩ কেজি পটাশ বা ৮.৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ; সঙ্গে দিন ৩ কেজি জিঙ্ক সালফেট, ১ কেজি ব্লু-গ্রিন অ্যালগি (জীবাণু সার) এবং ২৫০ গ্রাম অ্যাজোটোব্যাক্টর (জীবাণু সার); মাটিতে গন্ধকের অভাব থাকলে এছাড়াও দেবেন বিঘাতে আড়াই কেজি পরিমাণ গন্ধক।

আমন ধানের চারা লাগাবেন সারি থেকে সারি ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং সারির মধ্যে গুছি থেকে গুছি ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে। চারা রোয়ার সময় কাদানে মাটি মাখা মাখা ভেজা থাকলেই চলবে, ছিপছিপে জল না হলেও চলে।

আম : শ্রাবণমাসের বর্ষার আমগাছে ছত্রাকঘটিত পিঙ্ক রোগ পরিলক্ষিত হয়। ছত্রাকের সাদা আস্তরণ সরু ডালের ডগায় চোখে পড়ে। তাতে পাতাগুলি হয়ে যায় ফ্যাকাসে হলুদ, তারপর তা শুকিয়ে যায়। পিঙ্ক রোগ দেখা গেলে আক্রান্ত ডালগুলি মসৃণভাবে কাট-ছাঁট করে তাতে তামাঘটিত ছত্রকানাশকের পরত লাগাতে হবে। তারপরও দু-একবার কপার অক্সিক্লোরাইডের সিঞ্চন (লিটারে ৩ গ্রাম) ভালো কাজ দেয়। এই মাসে খেয়াল রাখতে হবে নার্সারিতে বা ছোটোগাছে কচি পাতায় কেড়ি পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে কিনা। কাঁচি দিয়ে কাটার মতো করে কুচি পাতা বোঁটার কাছ থেকে আড়াআড়িভাবে কেটে দেয় এই কীট। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কচি পাতা নির্গত হলে একদম ছোটো চারার গোড়ায় দানাদার কীটনাশক যেমন ফোরেট ১০ জি কয়েকগ্রাম ছিটিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়। কচি পাতা বেরোনোর সময় প্রতি লিটার জলে ১ মিলি ডাইক্লোরোভস বা আড়াই গ্রাম কার্বারিল গুলে দিলেও কাজ হবে।

এই সময় আম গাছে পাতা ও ডগা ঝলসা রোগ লাগে। এটি একপ্রকার ছত্রাকঘটিত রোগ। এই রোগের আক্রমণে কচি পাতা সমেত ডগা অংশটি গাঢ় বাদামী ও ক্রমে কালচে হয়ে ঝলসে যায়। এমন আক্রান্ত ডগাগুলি কেটে একসঙ্গে পুড়িয়ে ফেললে এবং বাগান সার্বিকভাবে আগাছা মুক্ত রাখতে পারলে রোগের লক্ষণ কমে। তাছাড়া ছত্রাকনাশক ক্লোরোথ্যালোনিল (২ গ্রাম), প্রপিনেব (২ গ্রাম), কার্বোণ্ডাজিম (১ গ্রাম) বা থায়োফেনেট মিথাইল (১ গ্রাম)— এদের যে-কোনো একটি ওষুধ প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করলে কাজ হবে। এই সময় কচিপাতা ও ডগায় অ্যানথ্রাকনোজ রোগের লক্ষণ চোখে পড়লে বৃষ্টিবিহীন দিনে ১৫ দিন অন্তর ২ বার কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্লাইটক্স) ৪ গ্রাম অথবা সাফ (কার্বেণ্ডাজিম + ম্যানকোজেব মিশ্রণ) ২ গ্রাম আঠাসহ গুলে স্প্রে করতে হবে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আম পাতায় শৈবাল আক্রমণে লাল মরচে রঙের উঁচু দাগ দেখা যায়। আঠা মিশিয়ে প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড স্প্রে করলে কাজ হবে।

আষাঢ় থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাসের মধ্যে আমগাছে প্রথম দফায় সার প্রয়োগ করতে হবে। পূর্ণ ফলনশীল গাছ প্রতি ১০০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২৫০ গ্রাম থেকে ৩৭৫ গ্রাম ফসফেট আর ৩৭৫ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম পটাশ দিতে হবে। সারগুলির মাত্রা হিসেব করে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট অব পটাশে সার জমিতে প্রয়োগ করুন। গোবর সার বাদ দিয়ে একই পরিমাণ সার বর্ষার শেষেও আমগাছে দিন। যারা আমের নতুন বাগান তৈরি করবেন তারা সংকর জাত হিসাবে আম্রপালি বা মল্লিকা লাগাতে পারেন। এগুলি নিয়মিত ও প্রচুর ফলন দেয়; ফলের গুণগত মানও উন্নত। এছাড়া স্থানীয় অর্থকরী জাত হিমসাগর, ল্যাংড়া, বোম্বাই এবং মালদার জন্য ফজলি লাগাতে পারেন। আম্রপালি ও মল্লিকাকে ৫ মিটার × ৫ মিটার দূরত্বে লাগানো যায়। অন্য জাতগুলি দ্বি-বেড়া সারি করে লাগান। সাধারণত ১০ মিটার × ১০ মিটার দূরত্বে চারা লাগানোর নিয়ম। এই পদ্ধতিতে ১০ মিটার দূরত্ব অন্তর ৫ মিটার × ৫ মিটার দূরত্বে দুই সারি চারা লাগান। এতে প্রায় ২২২ শতাংশ বেশি চারা লাগাতে পারবেন। ফলে একই জমি থেকে ফলন ও লাভ বেশি হবে। ■

লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করি : নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর রটানো কুৎসার জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি লখনউয়ে শিল্পপতি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশকে গড়ে তুলতে শিল্পপতিদেরও অবদান রয়েছে। ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে আমি ভয় পাই না।' প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণের ভিতর কংগ্রেস সভাপতিকে মুখের মতো জবাবই খুঁজে পেয়েছে রাজনৈতিক মহল। পাশাপাশি, শিল্প মহলও প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যে খুশি হয়েছে। শিল্প মহলের বক্তব্য, কংগ্রেস সভাপতি শুধু প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন, তাই নয়। তিনি দেশের শিল্পপতিদেরও অপমান করেছেন। বলা দরকার, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে 'স্যুট-বুটের সরকার' বলে বহুদিন ধরে কটাক্ষ করে আসছেন। সম্প্রতি লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দিতে উঠে প্রধানমন্ত্রীকে 'ভাগীদার' বলেও অশালীনভাবে আক্রমণ করেন রাহুল। লখনউয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এইসব সমালোচনারই মুখের মতো জবাব দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে একজন কৃষকের পরিশ্রমের অবদান রয়েছে, একজন শ্রমিকের পরিশ্রমের অবদান রয়েছে, একজন ব্যাংকারের অবদান রয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের অবদান রয়েছে, তেমনি দেশ গড়তে শিল্পপতিদেরও ভূমিকা রয়েছে। এই শিল্পপতিদের অপমান করব, তাদের চোর-লুটেরা বলব— এটা কী ধরনের কথা? এটা কি ঠিক নাকি?' কংগ্রেস সভাপতির নাম না করে প্রধানমন্ত্রী বলেন— 'অন্যদের মতো আমি প্রকাশ্যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে ভয় পাই না। কারণ, আমি কোনো অসৎ

উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের কাছে যাই না। আমি ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের কাছে যাই।'

এই বক্তব্যের রেশ টেনেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তবে, এমন মানুষ আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যার কোনো শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর সঙ্গে ছবি নেই। কিন্তু এটাও ঠিক, দেশে এমন একজনও উদ্যোগপতি নেই যিনি এইসব ব্যক্তির বাড়ি গিয়ে প্রণাম ঠুকে আসেননি।' সভায় উপস্থিত রাজ্যসভা সদস্য এবং প্রাক্তন সমাজবাদী পার্টি নেতা অমর সিংহকে দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন— 'এইসব ব্যক্তি কারা, তা উনি খুব ভালোভাবে জানেন। ওইসব লোকেরা প্রকাশ্যে শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখা করে না। কিন্তু পর্দার আড়ালে সবকিছু করে। আসলে ভয় পায় ওরা। কিন্তু আমি আড়ালে নয়, প্রকাশ্যেই শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করি। অন্যায় করি না, কাজেই আমার কোনো ভয়ও নেই।' মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন— 'মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিড়লাদের তো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বিড়লাদের বাড়িতে থাকতেনও। কিন্তু তার জন্য তিনি কখনো কুণ্ঠা বোধ করেননি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সৎ।'

অহরহ নানা ছুঁতোনাতায় যাঁরা সরকারের সমালোচনা করছেন, তাঁদের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি তো মাত্র চার বছর ক্ষমতায় এসেছি। কিন্তু গত সত্তর বছরে আপনারা কী করেছেন!' যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনারা সমালোচনা করছেন, তার সৃষ্টি এই চারবছরে নয়। তার সৃষ্টি গত সত্তর বছরে।'

লখনউয়ের এই অনুষ্ঠানে ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে ৮১টি লগ্নি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং বিড়লা, রিলায়েন্স প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরা। এই অনুষ্ঠানকে 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য' আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৬০ হাজার কোটি টাকা লগ্নি কোনো ছোটো ব্যাপার নয়। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এই ধরনের বড় লগ্নি টানতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিন্তু এই লগ্নি উত্তরপ্রদেশকে নতুন দিশা দেখাবে। দু' লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান হবে এর ফলে। এই গতিতে লগ্নি যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে উত্তরপ্রদেশ শীঘ্রই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৫০টিরও বেশি মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা উত্তরপ্রদেশে কাজ করছে। বিশ্বের সব থেকে বড় মোবাইল তৈরির কারখানা এখানে হয়েছে।' উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন দ্রুত হচ্ছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

আর্থিক বৃদ্ধির জন্য শিল্পক্ষেত্রে লাল ফিতের ফাঁস দূর করতে হবে : সুরেশ প্রভু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিল্প ক্ষেত্রে লালফিতের ফাঁস দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার কতগুলি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ কারণে এখন ১৩টি বিষয়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপও করা হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার যদি বাড়াতেই হয়, তাহলে শিল্পকে লালফিতের ফাঁস মুক্ত করতেই হবে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে প্রথমাবধি লাল ফিতের ফাঁস দূর করার কথা বলছে। অনেক ক্ষেত্রেই লাল ফিতের ফাঁস দূর করে প্রশাসনে গতি আনতেও সক্ষম হয়েছে এই সরকার। শিল্পক্ষেত্রেও যাতে এই গতি আসে তার জন্যও এবার হাতেকলমে কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, লাল ফিতের ফাঁস দূর করতে কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলিরও বড় ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা ব্যতীত এগনো সম্ভব নয়। তাই রাজ্য সরকারগুলি এ ব্যাপারে কতখানি সক্রিয় বা কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে— সে বিষয়েও কেন্দ্র খোঁজ নিচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এতসবের পরেও প্রশাসনিক সংস্কারে কিছু ফাঁক থেকে যেতেই পারে। তাই কেন্দ্র সরকারের নেওয়া উদ্যোগটি জেলাস্তরেও ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। সুরেশ প্রভু আরো জানান, আপাতত ১৩টি বিষয়কে বাণিজ্যমন্ত্রক বেছে নিয়েছে। এই ১৩টি বিষয়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়ে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে লাল ফিতের ফাঁস দূর করা হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভু জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দেশের বর্তমান আর্থিক বৃদ্ধি ৭ শতাংশকে ছাপিয়ে ১০ শতাংশে পৌঁছাক। কিন্তু এটা করতে হলে জেলাস্তরে পৌঁছনটা খুব দরকার। আপাতত ছ'টি জেলাকে বেছে নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে। এই ছটি জেলায় আর্থিক বৃদ্ধি ৩ শতাংশ বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। জেলাগুলিতে বিনিয়োগ আনতে

গেলে প্রশাসনিক জটিলতাও কমাতে হবে। সেই লক্ষ্যেই বাণিজ্যমন্ত্রক এগোচ্ছে। সেই কারণেই এখন ১৩টি বিষয়ে সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, যেগুলি কমবেশি সব জেলাতেই করা যায়।

সুরেশ প্রভু জানান, এই ১৩টি বিষয়কে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি ভাগ হলো— শিল্প বা ব্যবসার জন্য লাইসেন্স এবং তার নবীকরণ, কন্ট্রাক্টারদের রেজিস্ট্রেশন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি চালু করা। এই তিনটি বিভাগে প্রশাসনিক জট কাটানোর জন্যই ১৩টি বিষয়ে সংস্কারের কথা ভাবা হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রকের কর্তারা জানিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কারের পদক্ষেপেও কিছু বদল ঘটে। এটা একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া। বাণিজ্য মন্ত্রীর বক্তব্য, যেহেতু এবারই প্রথম জেলাস্তরে নেমে কাজ করতে চাইছে বাণিজ্য মন্ত্রক, তাই প্রাথমিকভাবে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি সংস্কারের কথাই ভাবা হয়েছে। তবে, পরবর্তীকালে এগুলির সঙ্গে কিছু শর্ত চাপানো হতে পারে। মন্ত্রী আরও বলেছেন, লাল ফিতের ফাঁস দূর করার লক্ষ্যে প্রথম দিকে রাজ্যস্তরে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। পরে তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যগুলিও সেইভাবেই নিজেদের তৈরি করতে পেরেছে। সেই কথা মনে রেখেই এবারও প্রথমেই বড় বড় শর্ত চাপিয়ে দিতে চাইছে না কেন্দ্র। বরং এখন ধীরে চলার নীতিই নেওয়া হয়েছে। পরে সময় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শর্ত বাড়ানো হবে।

ইসলামিক বাংলাদেশ

টাকা না পেয়ে প্রতিমা ধ্বংস, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সম্প্রতি বগুরা জেলার সোনাতলা উপজেলায় দাসপাড়া গ্রামে মুসলমান দুষ্কৃতীরা স্থানীয় হরিমন্দিরে ঢুকে দুটি প্রতিমার গলা কেটে ধ্বংস করেছে। গ্রামবাসীরা মহম্মদ আরিফুল ইসলাম এবং মহম্মদ আবদুল হান্নান নামের দুই ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। বাকি দু'জন পলাতক। তাদের নাম জাহিদুর রহমান এবং সাহিন ইসলাম। পুলিশ চারজনের নামেই ধর্মীয় অবমাননার মামলা রুজু করেছে। খবরে প্রকাশ, প্রথমে দুষ্কৃতীরা শ্রীশ্রী হরিমন্দিরের সভাপতি ঠুকু দাসের কাছে এক লক্ষ টাকা দাবি করে। সেই সঙ্গে হুমকি দেয় টাকা না দিলে মন্দিরের মূর্তি ভেঙে দেওয়া হবে। ঠুকুবাবু অত টাকা দিতে পারেননি। পরিণতিতে দুষ্কৃতীরা মূর্তি ভাঙে। বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে নয়া প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুর কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নারীর ক্ষমতায়নের দিকে আরও একধাপ এগোল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বীরেন্দ্রকুমার গত ৩১ জুলাই সংসদে জানান ভারত সরকারের বিভিন্ন নারীমুখী প্রকল্পে গ্রামীণ মহিলাদের যোগাদানের হার বাড়াতে কেন্দ্র ৫৪৩৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। তিনি জানান ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা শক্তি কেন্দ্র গঠন করে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয়স্তরে যৌথ সহযোগিতায় ২০১৭-১৮ ও ২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষের যোজনাও তৈরি হয়। ভারতের সম্ভাবনাময় ১১৫টি জেলাকে বেছে নিয়ে মহকুমা ও ব্লক স্তর পর্যন্ত কলেজ ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে গ্রামে গ্রামে মহিলাদের মধ্যে প্রচার চালানো হয়, যাতে তাঁরা নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত হন ও তার সুযোগ নিতে পারেন। এই প্রকল্পের জন্য ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫৪৩৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ও ৫২১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক অনুদানের হার ৬০ : ৪০। তবে উত্তর-পূর্বের মতো বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে এই হার ৯০ : ১০। এই প্রকল্পের রূপায়ণে দেশ জুড়ে ভালোই সাড়া পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ৬৪০টি জেলায় ডি এল সি ডব্লিউ (ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেন্টার ফর উওমেন) গঠিত হবে। যার প্রাথমিক কাজ বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্তে, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও পৌঁছে দেওয়া। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে বিশেষ করে অ-বিজেপি রাজ্যগুলির একদম নিচের স্তরে অর্থাৎ গ্রামীণ ক্ষেত্রে তার সুফল পৌঁছয়নি। এছাড়াও নানান ধরনের প্রশাসনিক অসুবিধেকেও এজন্য দায়ী করছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতেই নয়া প্রকল্পে অর্থ মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক। আশা করা যায়, নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে গতি আসবে ও এর সুফল গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।

সংসদে নারী কল্যাণ মন্ত্রী মানেকা গান্ধী।

অপরাধী আইন (সংশোধিত) বিল ২০১৮ লোকসভায় পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অপরাধী আইন (সংশোধিত) বিল ২০১৮ অনুমোদন করল লোকসভা। এর ফলে গত ২১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা অপরাধী আইন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সটি বাতিল হয়ে গেল। প্রস্তাবিত অপরাধী আইনে নারী ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের ধরা অনেক সহজ হবে। এই আইনে অপরাধীদের সাজাও দ্বিগুণ করা হয়েছে। বারো বছরের কমবয়েসি কোনও মেয়ের ওপর অত্যাচার হলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে বিলে। ষোলো বছরের কমবয়সিদের ক্ষেত্রে শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে বাড়িয়ে ২০ বছর করা হয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এই শাস্তি বাড়িয়ে যাবজ্জীবনের জন্যেও দেওয়া যেতে পারে। ১৬ বছরের কমবয়েসি মহিলাকে গণধর্ষণের ক্ষেত্রে শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। এই বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মেয়েদের ওপর শারীরিক অত্যাচারের তদন্ত এবং আদালতে তার শুনানির সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া। পুলিশের তদন্ত এবং আদালতে শুনানি বাধ্যতামূলকভাবে দু'মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। শুনানির আবেদন প্রত্যাহার করার সর্বোচ্চ সময় ছ'মাস। ষোলো বছরের কমবয়েসিদের ওপর অত্যাচার হলে অপরাধীকে আগাম জামিন দেওয়া যাবে না। লোকসভায় এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কিষেণ রিজিজু বলেন, 'ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে চায় সরকার। সেই লক্ষ্যেই এই বিল তৈরি করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, ধর্ষণ-সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার আরও ফার্স্ট ট্র্যাক আদালত গঠন করবে।

এই ধরনের মামলার শুনানি কেবলমাত্র মহিলা বিচারকদের এজলাসে করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও সরকার গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

স্মৃতিমেদুরতায় উত্তম

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিকাংশ খ্যাতিমান মানুষের জন্মদিন সাড়ম্বরে পালন করা একরকম গৃহীত রীতি। ব্যতিক্রম মহানায়ক উত্তমকুমার। সর্বাংশে রূপবান, লাবণ্যময় এক চিরকালীন সৌন্দর্যের অক্ষয় প্রতীকের প্রতি অনুরাগে তাঁর অকাল মৃত্যু দিনটিকেও আপামর বাঙালি স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছে। ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাইয়ের বর্ষণসিক্ত দিনে সম্ভবত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরেই কলকাতার দীর্ঘতম শোকমিছিল পথ চলেছিল।

এর অন্যতম কারণ দীর্ঘ তিনটি দশক ধরে বাঙালি জীবনে দেশভাগ, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, নকশাল আন্দোলন, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন সব কিছুর সঙ্গে সমান্তরালভাবে সংলগ্ন ছিল উত্তমের চলচ্চিত্র অভিযান। বাঙালি সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশেষত্ব, তার ভাবনাস্তর সবই তাঁর অভিনয় সৌকর্যে নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তমকুমারের মৃত্যু আকস্মিক হলেও এর পেছনেও রয়েছে তাঁর অভিনেতাসুলভ স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শুধু বাংলার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তিনি সর্বভারতীয় দর্শকের মন জয় করতে তৎকালীন দিনে বিপুল অর্থ ব্যয়ে 'ছোটি সি মুলাকাত' প্রযোজনা করেন। ছবিটির ফর্মুলায় কোনো ভুল ছিল না। তাঁর জীবনে নায়ক হিসেবে যথার্থভাবে প্রথম হিট আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি অবলম্বনে অগ্নিপরীক্ষা বাল্য বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রেমের জয়গান। তারই হিন্দি প্রডাকশনে অনেক বিষয়ের মধ্যে সুরকার নির্বাচনও ছিল নির্ভুল— সর্বজনপ্রিয় শঙ্কর জয়কিষান। ছিল অসংখ্য গান ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালার নাচ, কমিক চরিত্র। আজকের নায়করা বহু ধরনের নাচগান করে থাকেন। কিন্তু সেই ৬০-এর দশকে উত্তম বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে যে অসামান্য টুইস্ট নেচেছিলেন তা ছিল একটি সম্পূর্ণ প্রশিক্ষিত উপস্থাপনা। তাঁর সমকালীন দিকপাল রাজকাপুর, দেবানন্দ, দিলীপকুমাররা ওই নাচের কথা ভাবতেই পারতেন না।

কিন্তু ছবিটি হয়ে পড়েছিল কুশলী সম্পাদনার অভাবে পৃথুল। দর্শক সেই বোঝা নিতে পারেনি। গোটা ছবি জুড়ে রঙিন উত্তম ছিলেন সর্বাংশেই দেদীপ্যমান। তবু শেষমেশ ছবিটি তুমুলভাবে ব্যর্থ হয়। বম্বে থেকে ফেরার পথে হৃদরোগে আক্রান্ত হন মহানায়ক। আক্ষরিক অর্থেই তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এই বিপর্যয়ের ধাক্কা তাঁর থেকেই যায়। অথচ হিন্দিতে পরবর্তীকালে তাঁর অমানুষ বা আনন্দ আশ্রমের সাফল্য সকলেই জানেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেক কিছুর মধ্যে বাংলা চলচ্চিত্রে সুচিত্রা সেনকে নিয়ে ৩০টি সার্থক ছবির জুটি দিয়েছিলেন, তা বম্বেতেও সংখ্যার নিরিখে আজও পাওয়া যাবে না।

হলিউডের সর্বাধুনিক অভিনয় আয়ত্ত করতে তিনি নিয়ম করে সেসব ছবি দেখতেন। তাঁর প্রথম প্রযোজনা বাঙালির চিরকালীন গর্ব 'হারানো সুর', হলিউডের Random Harvest-এর ছায়ায় তৈরি। বিপুল হিট ছবি 'চাওয়া পাওয়া' অতি জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা Gregory Pecke, Audrey Hepburn-এর Roman Holiday অবলম্বনে। তবে তিনি কখনই অন্ধ অনুকরণে যাননি। একসময় বাঙালি যেমন ধুতির ওপর কোট চাপিয়ে নির্ভুল ইংরেজি বলে কোর্ট কাছারি চালাত, তিনিও ছিলেন ঠিক তাই। সুচিত্রাকে নিয়ে বাঙালি রোমান্সের নতুন সঙ্গী তৈরি করেছিলেন।

অথচ একটু বয়স বাড়তেই কুশলী পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে দিয়ে চরিত্রাভিনেতা হিসেবে আদ্যন্ত বাংলার মার্কামারা ধন্যি মেয়ে, অগ্নীশ্বর, মৌচাক, নিশিপদ্মের মতো সুপার হিট ছবি করলেন। আরও আগে বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া সলিল দত্তের 'অপরিচিত' বা সত্যজিৎ রায়ের যুগল উপহার 'নায়ক' ও 'চিড়িয়াখানা'র অসামান্য অভিনয় এখন ফিল্ম স্কুলগুলিতে দেখানো হয়। তাঁর অভিনয়ের ব্যপ্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল প্রথম বছরের 'ভরত পুরস্কার' জিতে নেওয়া। সম্পূর্ণ দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্র ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ, কবিয়াল এন্টনী। সত্যজিৎ তাঁর প্রথম শোকসভায় বলেছিলেন, ''আমার নিজের কাজে হয়তো অদল বদল করা যেত কিন্তু উত্তমের কাজে আমি কোনো ত্রুটি খুঁজে পাইনি। উত্তমের মতো কেউ নেই, কেউ হবেও না।'' মৃত্যুর এত দীর্ঘদিন পরে এমন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভাব দেখে মনে হয় আকাশের মতো মানুষের মনেও উত্তম একটা মেঘমেদুর অঞ্চল তৈরি করে গেছেন। একটু ছোঁয়া দিলেই সুখ-দুঃখ মিশ্রিত বৃষ্টিপাত হয়। উত্তম হয়ে ওঠেন আরও ঝকঝকে নতুন। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

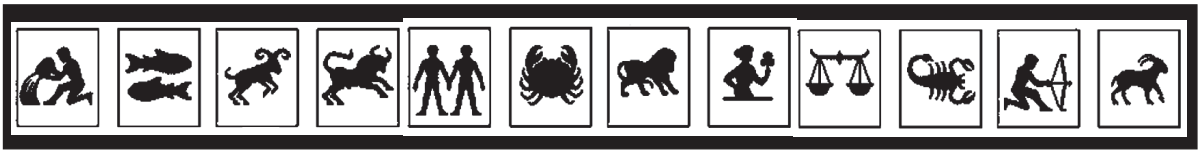

৬ আগস্ট (সোমবার) থেকে ১২ আগস্ট (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রবি-বক্রী বুধ। কন্যায় শুক্র, তুলায় বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে বক্রী মঙ্গল-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র বৃষে কৃতিকা থেকে সিংহে মঘা নক্ষত্রে।

মেষ : শরীরের যত্নের প্রয়োজন। প্রতিভার স্ফূরণ, সাধনায় দীপ্তি, চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন। সন্তানের চৌম্বকীয় বাচনভঙ্গি ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্য। শিল্প, সংগীত, কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ও মান্যতা। বিলাসদ্রব্য, গাড়ি, বাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা।

বৃষ : পারিবারিক কর্তব্য সমাধায় মানসিক চাপ থাকলেও হতাশার কারণ নেই। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতিতে বিলম্ব হলেও শেষ রক্ষা হবে। বিতর্কিত পরিবেশ এড়িয়ে চলা শ্রেয়। দালাল, প্রোমোটার, রিপ্রেজেন্টেটিভ ও ব্রোকারদের আর্থিক শুভ।

মিথুন : পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর প্রতি মমত্ব। পিতৃবিত্ত সংক্রান্ত বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। দেব-দ্বিজে ভক্তি, পূজা-পাঠে আগ্রহ, গুরুজনে শ্রদ্ধা ও তীর্থভ্রমণের সম্ভাবনা। একাধিক উপায়ে উপার্জনের চিন্তা ফলপ্রসূ হবে। সন্তানের মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ।

কর্কট : সমাজ কল্যাণে দান, ধ্যান, মহতী অনুষ্ঠানে সজ্জনের সান্নিধ্য ও নতুন প্রাপ্তি। স্বজন সম্পর্ক ও গৃহের নেতিবাচক পরিবেশ অস্বস্তিকর। ভ্রাতা-ভগ্নির উচ্চশিক্ষায় আশাতীত সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা। গৃহ ও বাহন যোগ।

সিংহ : ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ধনলক্ষ্মীর ধনবর্ষণ, সাহিত্যানুরাগী, প্রযুক্তিবিদ, সঞ্চালক ও নায়ক-নায়িকাদের সফল মনস্কাম। প্রিয়জনের বিবাহে অংশগ্রহণ, সন্তানের মেধার বিকাশে দৈবী কৃপায় স্বাভাবিক বর্ষণ। প্রণয়ের সুপ্তবহ্নিতে স্বস্তির প্রলেপ।

কন্যা : উদার হৃদয়ের বিকাশ। বকেয়া পাওনার প্রাপ্তি লিখিত চুক্তিতে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। গুরুজনের স্বাস্থ্যাবনতির সম্ভাবনা। সন্তানের বিভাগীয় পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফললাভ, খনিজ ও রাসায়ণিকের ব্যবসায় শুভ।

তুলা : যুবক বন্ধু, অবিবাহিত ব্যক্তি ও হঠকারী সিদ্ধান্ত বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। পৈতৃক ব্যবসায় বিনিয়োগে বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আভিজাত্য গৌরব। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ। নিজ কর্মদক্ষতায় প্রশাসনিক দায়িত্বে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা। স্বর্ণ, মনোহারী, ঔষধী ও ফ্যাশনেবল ব্যবসা আথিক উন্নতির সহায়ক।

বৃশ্চিক : ভালোবাসায় ভিজিয়ে দেওয়া মন। গুরুজনে শ্রদ্ধা, সদ্ব্যবহার, সুন্দর শাস্ত্রীয় জ্ঞান, পার্থিব সুখ। কুটিল কুটুম্বের কূটচালে মানসিক বিভ্রান্তি। পুলিশ, সেনাধ্যক্ষ, ক্রীড়াবিদ, মেকানিক্সের দক্ষতা বৃদ্ধি ও শংসা লাভ। আয়ের একাধিক সূত্রের সন্ধান।

ধনু : চিন্তার স্বচ্ছতা, স্নেহপ্রবণ উদার মন। সমাজকল্যাণমূলক কর্মে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে উজ্জ্বল কীর্তি ও বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। গুণীজন ও সুহৃদ সান্নিধ্য বিদ্যার্থীর জ্ঞানার্জনের সার্থক প্রয়াস। পিতার বৈষয়িক অভিজ্ঞতা নিরানন্দ পরিবেশে আনন্দধারা প্রবাহের সহায়ক।

মকর : সজীব ও সাবলীল ভঙ্গিতে পরোপকারের বিরামহীন প্রয়াস। একই কাজে একাধিকবার প্রচেষ্টার প্রয়োজন। গৃহের পরিবেশ জাতকের অনুকল নহে। আর্থিক লেনদেন বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সন্তানের পড়াশুনায় একাগ্রতার অভাব ও মানসিকতায় আধুনিকতার পরশ।

কুম্ভ : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতায় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বিদ্যার্থী, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবহারজীবী, সাংবাদিকের দক্ষতার বহুমুখী প্রকাশ ও সম্ভ্রম প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে দূর ভ্রমণ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে উদাসীনতা ও একাকীত্ববোধ, আর্থিক চলনসই অবস্থা।

মীন : পরিজনপ্রিয়, ধর্মানুরাগী, দয়ার্দ্রহৃদয়, স্বাভিমানী, সুন্দরের পূজারী, প্রভাব। বর্তমান সপ্তাহে ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি ছায়াসঙ্গী হিসাবে সঙ্গে থাকবে। গুরুজনের পরামর্শ চলার পাথেয়। প্রেমের পূর্ণতা। ব্যবসায় বিনিয়োগ ও ক্রয়-বিক্রয় অনুকুল নয়।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য